ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন

সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী
অনুবাদ : আবদুল মার্দান তালিব

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.icsbook.info
প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোনঃ ৭১১৫১৯১১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ এফঃ ১৬৫

১ম প্রকাশঃ ১৯৯১
৮ম প্রকাশ
মুদ্রণ
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

নির্ধারিত মূল্যঃ ৪০.০০ টাকা

মুদ্রণ
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

টেকটিলের অনুবাদ
ISLAMI RENESA ANDOLON by Sayyed Abul A'l'la Maudoodi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 40.00 Only.

www.icsbook.info
ধৃত্রিকা

ইসলামের সর্বাধিক ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলোর মধ্যে ‘মুজাদিদ’ শব্দটি অন্যতম। এ শব্দটির একটি মৌটামুটি অর্থ প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তি জানেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি দীনকে নতুন করে সজ্জিত ও সতেজ করেন তিনি মুজাদিদ। কিন্তু এর বিতর্কিত অর্থের দিকে অতি অন্য লোকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দীনের ‘তাজীদ’—সংস্কারের তাত্ত্বিক কি, কোন ধরনের কাজকে পূর্ণ ‘তাজীদে’ বলা যেতে পারে, এ কাজের কোন বিভাগ আছে, কোন ধরনের কাজকে ‘তাজীদে’ বলা যেতে পারে এবং অংশিত তাজীদের বা কাজকে বলে, একথা অন্য লোকেই জানেন। এ অংশের কারণেই সাধারণ মানুষ ইসলামের ইতিহাসে মুজাদিদ আখ্যায়িকারী মনীষীদের কর্মকাণ্ডের নির্দেশ পর্যালোচনা করতে অক্ষম। তারা স্বীকার করে যে, উমর ইবনে আবদুল্লাহ আরায়, ইমাম গাজালী, ইবনে তাইমিয়া, শায়খ আহমদ সরহীদী, শাহ ওয়ালিউদ্দালাহ এরা সবাই মুজাদিদ। কিন্তু তারা জানে না, এদেরকে কোন পর্যায়ের মুজাদিদ, বলা যেতে পারে এবং কার সংক্ষারমূলক কার্যালী কোন ধরনের এবং কোন কর্মাদার অধিকারী? এ অক্ষমতা ও গাফিলতির অন্যতম করণ হলো, যেসব নামের সাথে ‘হমরত’ ‘ইমাম’ ‘হুজাতুল ইসলাম’ ‘কুতুবুল্লাহ-আরেফিন’, ‘যুবদাতুস সালেকীন’ এবং এ ধরনের শব্দগুলী সংযোজিত হয়, মন-মন্দিত তাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় এইটা আচরণ হয়ে পড়ে যে, এরপর স্বাধীনতার তাদের কার্যালী পর্যালোচনা করে তাদের মধ্যে থেকে কে এ আনুসারীদের জন্য কর্মকাণ্ড এবং কোন পর্যায়ের কার্য সম্পাদন করেছেন এবং এ কার্যে তার নিজের অংশ কর্মকাণ্ড—এ সাথক সংদেহে পৌছানো অস্বীকার হয়ে পড়ে। সাধারণত এ মনীষীদের কর্মকাণ্ডের অনুসারীদের মাপাজোকা তাদের পরিবর্তে ভক্তি-শ্রদ্ধা মিশ্রিত কার্য ভাবার বর্ণ করা হয়। ফলে পাঠক ভাবেন এবং তাদের লেখকের মনে একথা থাকে যে, যার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, ‘তিনি কামেল পুরুষ’ ছিলেন এবং তিনি যাকিছু করেছেন তা যে কোনো দিক দিয়েই ‘কামালিয়াত’—পূর্ণতার সর্বশেষ স্তরে উপনৈত হয়েছিল। অথচ বর্তমানে যদি আমাদেরকে ইসলামী আনুসারীদের সংস্কার এবং পুনর্জীবনের জন্য কোন প্রচেষ্টা চালাতে হয়, তাহলে এ ধরনের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও অস্পষ্টতার দ্বারা কোন কাজ চলবে না। আমাদেরকে এরপূর্বে এ সংস্কারমূলক কাজকে বুঝতে হবে। আমাদেরকে নিজেদের অতীত ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে হবে যে, বিগত শতাব্দীসমূহে আমাদের নেতৃবৃন্দ কর্মকাণ্ডের কাজ কিভাবে করেছেন, তাদের কার্যালী থেকে আমরা কতটুকু লাভবান হতে পারি এবং তাদের কোন।
কোনো কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, সেগুলোর দিকে আমাদেরকে এখন দৃষ্টি
দেয়া উচিত।

এ বিষয়টি আলোচনার জন্য একটি পৃথক পুস্তকের প্রয়োজন। কিন্তু
পুস্তকের লেখার অবসরই বা কোথায়? শাহ ওয়ালিউদ্দালাহ সাহেবের প্রস্পাঞ্চ
উক্তি হয়েছে, এতটুকুই যথেষ্ট। এ কারণেই বিষয়টি সামান্য আলোচনা
করার সুযোগ পেয়েছি। হয়তো আমার এ সামান্য আলোচনা কোন সুখোগ
ব্যক্তির জন্য ইসলামের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস রচনা করার পথ
প্রশস্ত করে দেবে।

এ প্রবন্ধটি বর্তমানে পুস্তকাকারে ছাপা হলেও আসলে এটি বেরিলির
'আলোকারন' পত্রিকার শাহ ওয়ালিউদ্দালাহ সংখ্যার জন্যে লেখা হয়েছিল। তাই
এতে শাহ সাহেবের সংক্রান্ত কার্যকরীর প্রতি তুলনামূলকভাবে অধিক
বিস্তারিত দৃষ্টি নিকেপ করা হয়েছে এবং অন্যান্য মুজাহিদগণের কার্যকরী
প্রস্তুতক্ষেত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রবন্ধটি পাঠ করার সময় যে রাখা উচিত
মাত্র খুব কম বর্ণনা করা যায় এবং কিছু সচেতনতার বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ
পড়ে না। এছাড়া পুস্তকের যে কিছু বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নার্থীকে আমি
দিয়েছিলাম। তবুও এর পরে প্রশ্নার্থীদের মুখ বদ্ধ হবে না, তবুও প্রশ্নার্থী
কর্ম প্রার্থিত হওয়া থেকে বহুলাংশে নিঃসৃতি পাবে।

-আবুল আলা
ফেরুয়ারী, ১৯৪০ইং

সামাজিকতালের ফের্তানাবাজ লোকেরা এ বইটিকে লক্ষ্য করে বিশেষভাবে
তাদের নিশাচারায় শুরু করেছেন। তাই আমি বইটি দ্বিতীয়বার পর্যালোচনা
করে এর মতবাদ বাক্যায়ন থেকে নানান অংশ সৃষ্টি করার হচ্ছিল, সেগুলোকে
সুপরিলক্ষিত করে দিয়েছি। এই সংগে সেই সর্বশেষ বিবৃতি ও উদ্ভাবনের বরাতও
দিয়েছি, যেগুলো সর্বক্ষেত্রে এই মন করে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল যে,
হয়তো
এগুলো আমার নিজের মনগড়। এছাড়া পুস্তকের শেষাংশে পরিশীলিত হিসাবে
ধিকপরা জবাব দেওয়া সম্ভবঃ দেখিয়েছি। এ জবাবগুলো 'তজ্জুমানুল কুরআন'-এর
মাধ্যমে ধিকপরা দেওয়া সময়ে বিভিন্ন প্রশ্নার্থীকে আমি
দিয়েছিলাম। যদিও এরপরও
প্রশ্নার্থীদের মুখ বদ্ধ হবে না, তবুও প্রশ্নার্থীর কর্ম প্রার্থন হওয়া থেকে
বহুলাংশে নিঃসৃতি পাবে।

-আবুল আলা
অক্টোবর-১৯৬০ইং
### সূচিপত্র

<table>
<thead>
<tr>
<th>নাম</th>
<th>পৃষ্ঠা</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ইসলাম ও জাহেলিয়াতের আদর্শিক ও ঐতিহাসিক ঘন্ত্রি</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>জীবন সম্পর্কে চারটি মতবাদ</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>নিভোজ্জল জাহেলিয়াত</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>শেরকামিশ্রিত জাহেলিয়াত</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>বৈরাগ্যবাদী জাহেলিয়াত</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>ইসলাম</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>মুজাফ্ফিদের কাজ কি ?</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>অভিনবত্তু ও সংঘারের মধ্যে পার্থক্য</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>মুজাফ্ফিদের সংজ্ঞা</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>মুজাফ্ফিদ ও নবীর মধ্যে পার্থক্য</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>মুজাফ্ফিদের কাজ</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>কামেল বা আদর্শ মুজাফ্ফিদ</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>ইমাম মেহদী</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>নবীদের মিশন</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>নবীর কাজ</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>খেলাফতে রাশেদা</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>জাহেলিয়াতের আক্রমণ</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>মুজাফ্ফিদের প্যারোজন</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>‘মাই ইউজাফ্ফিদমুলাহা দীনাহা’ হাদীসটির ব্যাখ্যা</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>মুসলিম জাতির কর্তিলক্ষ বড় বড় মুজাফ্ফিদ ও তাদের কার্যকারী</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>উমর ইবনে আবদুল আবীয়</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>চার ইমাম</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>ইমাম গাজীলী (র)</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>ইবনে.তাইমিয়া (র)</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>শায়খ আহমদ সরহিদী (র)</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>শাহ ওয়ালিউদ্দাল দেহলবীর কার্যকারী</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>সমালোচনা ও সংশোধন</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>গঠনমূলক কাজ</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>ফলাফল</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>সাইয়েদ আহমদ বেরিলী (র) ও শাহ ইসমাইল শহীদ (র)</td>
<td>82</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ব্যর্থতার কারণ
84
প্রথম কারণ
85
দ্বিতীয় কারণ
87
তৃতীয় কারণ
88
শেষ কথা
91
পরিশিষ্ট
93
তাজদীদের প্রকৃতি ও ইমাম মেহদী
94
কাশ্য ও ইলহামের তাৎপর্য এবং কাতিপয় মুজাদ্দিদের দাবী
98
তাসাউফ ও শায়খকে ধ্যান করা
104
একটি মিথ্যা দোষারোপ ও তার জবাব
109
আল মেহদীর আলামত ও ইসলাম ব্যবস্থায় তার স্বরূপ
113
মেহদী সমস্যা
116
পৃথিবীতে মানুষের জন্যে যে জীবন ব্যবস্থাই রচিত হবে তার অনিবার্য
যাতায়াত হবে অতি-প্রাকৃতিক বা ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়বলী থেকে। মানুষ সম্পর্কে
এবং এ পৃথিবী—যার মধ্যে সে বাস করে—তার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও দাদার্থীন
ধারণা সৃষ্টি না করা পরম্পরা মানুষের কোনো পরিকল্পনা প্রণীত হতে পারে না।
দুনিয়ায় মানুষের আচরণ কেমন হবে এবং এখানে তাকে কিভাবে কাজ করতে
হবে, এ প্রশ্ন অসলে এই পরবর্তী প্রশ্নগুলোর সংগে গতীর সম্পর্ক রাখে যে,
মানুষ কি ? এ দুনিয়ায় তার মর্যাদা কি ? এ দুনিয়ায় ব্যবস্থা কোন ধরনের, যার
সংগে মানুষের জীবন ব্যবস্থার সামাজিক শীল হতে হবে ? এ প্রশ্নগুলোর যে
সমাধান নিতে হবে, সে পরিরক্ষিতে নৈতিকতা সম্পর্কে একটি বিষয় মত
স্বীকৃত হবে। অতঃপর ঐ মতবাদের প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষের জীবনে বিভিন্ন
বিভাগ গড়ে উঠবে। আবার এই কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিগত ও কর্মকাণ্ড এবং
সামাজিক সম্পর্ক ও ব্যবহার বিধানবলী বিভাগের রূপ পরিপ্রেক্ষা করবে। এভাবে
অবশেষে এ সবের পরিরক্ষিতে তমুদ্বুনের বিরুদ্ধে তাতাতের নিমিত্ত হবে। দুনিয়ায়
আজ পরম্পরা মানুষের জন্যে যতগুলো ধর্ম এবং মত ও পথ তৈরী হয়েছে,
তাদের প্রত্যক্ষ অবশিষ্ট নিজের একটি শব্দে মৌলিক দর্শন ও মৌলিক
নৈতিক মতবাদ প্রণয়ন করতে হয়েছে। এই মৌলিক দর্শন ও নৈতিক
দৃষ্টিগৃহই মূলনীতি থেকে নিয়ে খুঁটিনাটি বিষয়েও একটি পর্যায়ক্রমে অন্যটি
থেকে পৃথক করে। কেননা তাদেরই প্রকৃতি অনুযায়ী প্রত্যক্ষ জীবন বিধানের
প্রকৃতি গড়ে উঠছে। তারা জীবন বিধানের দেহে প্রাণের ন্যায়।

**জীবন সম্পর্কে চারটি মতবাদ**

খুঁটিনাটি বিষয় বাদ দিয়ে ধুমাত্র মূলনীতির পরিরক্ষিতে বিচার করলে
মানুষ ও বিশ্বজাহান সম্পর্কে চারটি অতিপ্রাকৃত (Metaphysical) মতবাদ
স্থায়ীভূত হতে পারে। দুনিয়ার যতগুলো জীবন বিধানের অস্তিত্ত পাওয়া যায়,
তার প্রত্যেকেই এই চারটির মধ্যে থেকে যে কোনো একটিকে অবশিষ্ট গ্রহণ
করেছে।

**নির্ভেজাল জাহেলিয়াত**

প্রথম মতবাদটিকে আমরা নির্ভেজাল জাহেলিয়াত আখ্যা দিতে পারি। এর
মূল কথা হলো।
বিশ্বজাহানের ব্যবস্থাপনী একটি আকৃতিক ঘটনার বাস্তব প্রকাশ মাত্র। এর পেছনে কোনো প্রভা, সদিচ্ছা ও মহান উদ্দেশ্য কার্যকরী নেই। এমনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এটি তৈরী হয়েছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে একদিন হঠাৎ কোনো কার্যকরিতা ছাড়াই শেষ হয়ে যাবে। এর কোনো খোদা নেই আর যদি থেকেও থাকে, তাহলে মানুষের জীবনের সংগে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

মানুষ এক ধরনের পশু। অন্যান্য পশুর নয় সন্তরঞ্জ ঘটনাক্রমে এখানে তার উভয় হয়েছে। তাকে কে সৃষ্টি করলো এবং কেন সৃষ্টি করলো, এ প্রশ্ন আমাদের নিকট অপ্রাসঙ্গিক। আমরা শুধু একটুকু জানি যে, এ পৃথিবীতে তার বাস, তার কিছু আশা-আকাংক্ষা আছে—এগুলো পূর্ণ করার জন্যে তার প্রকৃতি ভেতর থেকে চাপ দেয়। তার কিছু শক্তি ও করণশক্তি যাত্রা আছে—এগুলো তার আশা-আকাংক্ষাসমূহ পূর্ণ করার মাধ্যম হিসেবে পরিণত হতে পারে। তার চারপাশে দুনিয়ার বিশাল বক্ষ জুড়ে অনেক বস্তু, অনেক সাজ-সরঞ্জাম, দেখা যাচ্ছে—এগুলোর ওপর ঐ শক্তি ও যন্ত্রসমূহ ব্যবহার করে সে তার আশা-আকাংক্ষা পূর্ণ করতে পারে। কাজেই নিজের জৈব প্রকৃতির দাবি পূর্ণ করা ছাড়া মানুষের জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আর এ দাবি পূর্ণ করার জন্যে উৎকৃষ্টতর উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা ছাড়া তার মানবিক শক্তি-সামর্থ্যের বিভিন্ন কোনো কার্যকরিতাও নেই।

মানুষের চাইতে বড় আর এমন কোনো জ্ঞানের উৎস এবং সৎ ও সত্যের উত্পত্তিহীন নেই, যেখানে এখানে তার জীবনের জন্যে বিদ্যালয় লাভ করতে পারে। কাজেই নিজের চারপাশের পরিবেশ, পরিস্থিতি, নিদর্শনালী এবং নিজের ইতিহাসের পরিক্ষ-নিরীক্ষা থেকে তার নিজেকেই একটি জীবন বিধান রচনা করা উচিত।

বাহ্যতঃ এমন কোনো সরকার দৃষ্টিগোচর হয় না, যার সমুখে মানুষকে জবাবদিদি করতে হবে। তাই মানুষ সত্তার একটি অদায়িতুশীল প্রাণী। আর যদি কোনো ক্ষেত্রে তাকে জবাবদিদি করতে হয়, তাহলে তা করতে হবে তার নিজের সমুখে আখ্যা সেই কর্তৃত্বের সমুখে যা মানুষের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়ে মানুষের উপর বিরাজিত।

কার্যকর্তার ফলাফল এই পারিবারিক জীবনের পত্তীতেই সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো জীবন নেই। কাজেই দুনিয়াকে প্রকাশিত ফলাফলের পরিশোধিতেই ভূল ও নির্ভুল, শক্তিকর ও লাভজনক এবং ঘটনাযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য মীমাংসা করা হবে।
মানুষ যখন নির্ভূত জাতিতের পর্যায়ে অবস্থান করে অর্থাৎ যখন
নিজের অনূর্ধ্ব-গাঢ়ের বাইরে কোনো সত্য পর্যন্ত সে পৌছে না অথবা
ইন্দিরার দায়িত্বের কারণে পৌছতে চায় না, তখন তার মনোজ্ঞগত পূর্বসূত্রে এ
মতবাদের আলোচনা আসে। পার্থিব ব্যাপারের মৌখ অথবা মানুষের প্রতি যুগে
এ মতবাদ গ্রহণ করেছ। মুক্তিময় ব্যতিক্রম ছাড়া সকল রাজা-বাদশাহ,
আমীর-উমরাহ, শাফায়াম, শাসক সমাজ, বিতর্কশীলি ও বিতর্কের পিছনে জীবন
উৎসর্গকারীরা সাধারণভাবে এ মতবাদকে অবহিতকার দান করেছে। আর
ইতিহাসে যেহেতু জাতির উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতির বদল পৌরী গাওয়া হয়,
তাদের প্রায় সবাই সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলে এ মতবাদের কার্যকরী ছিল। বর্তমান
পশ্চাতে সভ্যতার মূলেও এই মতবাদ কার্যকরী আছে। যদিও পাশাপাশি দেশের
সবই খোদা ও আখেরাতকে অবহিত করে এবং চিত্রার দিক দিয়ে সেবাই
বস্তুবাদী নৈতিকতার সমর্থক নয়, তবুও তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির সাময়িক
ব্যবস্থায় যে শক্তি ক্রিয়াশীল তা ঐ খোদা ও আখেরাত অবহিত এবং ঐ
বস্তুবাদী নৈতিকতার শক্তি। এ শক্তি তাদের জীবনে এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে
যে, যেখান লোক চিত্রাক্ষেত্রে খোদা ও আখেরাতকে অবহিত করে এবং
নৈতিকতার ক্ষেত্রে অবস্থানীয় ঢুটির অনুসরণ করে, তারা ও অবচেতনভাবে
নিজেদের বাস্তব জীবনে নান্দিক ও বস্তুবাদী ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা
চিত্রার ক্ষেত্রে তারা যে মতবাদের অনুসারী তাদের বাস্তব জীবনের সংগে তার
কোনো কার্যকরী সম্পর্ক নেই।

তাদের পূর্বের সম্প্রদায় ও খোদা বিদ্রূপ লোকদের অবস্থাও ছিল
অসুস্থ। বাগদাদ, দামেক্স দিল্লী ও প্রাচীন সম্প্রদায় লোকরা মুসলমান
হবার কারণে খোদা ও আখেরাত অবহিত করতো না। কিন্তু তাদের জীবনের
সমস্ত কর্মসূচি এমনভাবে তীর্থ হতো যেন খোদা ও আখেরাতের কোনো
অন্তিম নেই, কারার নিকট জায়গা দেবার এবং কারার কাছ থেকে নির্দেশ
গ্রহণ করারও কোনো প্রচুরই নেই। দুনিয়ায় একমাত্র তাদের কামনা-বাসনা,
আশা-আকাংক্ষাই অন্তিম আছে। আর এই কামনা-বাসনা পূর্ব করার জন্যে যে
কোনো উপায়-উপকরণ এবং যে কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করার ব্যপারে তারা
ব্যাধিন। দুনিয়ায় জীবন-শাসনের যে সময়ের পাওয়া গেছে, একমাত্র ‘ভোগ ও
বিলাসিতার’ মধ্যেই তার সহ্যব্যবহার হতে পারে।

আগেই বলেছি, এ মতবাদের প্রকৃতি হলো এই যে, এর ভিত্তিতে একটি
নির্ভর্জাল বস্তুবাদী নৈতিক ব্যবস্থা জন্মলাভ করে। তা বইয়ের পাতায় লিখিত
থাকব্যে কেবল মানস রাজ্যে চিত্রিত হয়ে থাক, তাতে কিছু আসে যায় না।
তারপর ঐ মানসিকতা থেকে জ্ঞান, শিল্প, চিত্র ও পরিকল্পনার ধারা উৎসারিত

www.icsbook.info
হয় এবং সম্মান শিক্ষা ব্যবস্থায় নাতিকাবাদ ও বক্তব্যের সুশীলতার শক্তি অনুপ্রেরণ করে। অতীতে এরই ভিত্তিতে ব্যক্তি চরিত্র গড়ে ওঠে। এ নকশার আনুষ্ঠানিক মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, আচার-ব্যবহার ও লেন-দেনের যাবতীয় নিয়ম-পদ্ধতির রূপ পরিবর্তন করে। আইন ও সংবিধানের বিকাশ ও অগ্রগতি এরই ভিত্তিতে হয়। সবচাইতে বড় প্রতারক, নেতৃমান, আত্মসাত্বিক, মিথ্যাকাজ, যোগাযোগ, নিষ্ঠুর ও কলুম্বিত হন্তের সম্পদে লোকেরাই এখন সমাজের উপরিভাগে স্থান লাভ করে। সমস্ত সমাজের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা এবং রাজ্যের পরিচালনার দায়িত্ব তাদের হাতে নায়ক থাকে। আর তারা শিক্ষালঘু বাণীর মতো সবরকমের ভীতি ও হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব মুক্তি হয় মানুষের ওপর রেখামুক্ত হয়। তাদের সমস্ত কৃষটীতি মেকিয়াওলি (Machiavelli) রাজনীতিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। তাদের আইন পুনর্বার শক্তির নাম ‘হক’ এবং দূর্বলতার নাম ‘বাতিল।’ যেখানে কেন্দ্রী বিশ্বব্যাপী প্রতিব্যাপ্ত থাকে না, সেখানে কেন্দ্রী জিনিসকে তাদেরকে যুগলুম থেকে বিভক্ত থাকতে পারে না। এ যুগলুমর অভ্যন্তরে এমন ভয়েবাহ রূপ পরিণত হয়ে যায়, শক্তিশালী শ্রেণী নিজের জাতির দূর্বল শ্রেণীর লোকেদেরকে পিষে ফেলতে থাকে এবং দেশের সীমানা পরিয়ে বহিবিষ্ক জাতীয়তাবাদ, সম্রাট্যাবাদ, দেশ জয় ও জাতি ধর্মসের রূপ এর আমেরিকার ঘটে।

শেরক মনিষিন জাহেলিয়ান

দ্বিতীয় অতিপ্রাকৃত মতবাদ শেরকের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর সারকথা হলো: বিশ্বজগতের এ ব্যবস্থা কোনো ঘটনানৈক্যপ্রাকার নয় এবং খোদাহীন অভিজ্ঞতারও অভিজ্ঞতারও নয়, কিন্তু এর একটি খোদা নয়, বহু খোদা আছে।

এ ধারণা কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণনৈক্যপ্রাকার নয় বরং নিহত কন্দোনা নিহত। তাই কাল্পনিক, অনুভূতিভাবনা ও দৃশ্যমান বক্তৃতার সংগে খোদার শক্তির সম্পর্কের কথার ব্যাপারে মূলকরণের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোনো একমতী প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কোনোদিন হতে পারে না। অন্তরালে দিশেসমুদ্র মানুষর যার ওপর হাত রেখেছে, তাদের খোদা বানিয়ে নিয়েছে। খোদার ফিলিস্টিকে হামেশা সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়েছে। ফেরেশতা, জীবন, আবাস, নক্সু, জীবিত ও মৃত মানুষ, বুক্স, পাহাড়, পাহাড় নদী, পৃথিবী, আগন ইত্যাদি সবকিছুকেই দেবতার পরিণত করা হয়েছে। এখানে, কামনা, সৃষ্টি শক্তি, রোগ, যুগ্ম, লক্ষ্যী, শক্তি ইত্যাদির নয় অনেক বিমূর্ত ধারণাকেও খোদার আসন বসানো হয়েছে। সিন্ধ-মানুষ, মৎস-মানুষ, পক্ষি-মানুষ, চারু মন্দকালী, সহস্রভূজ, হস্তশোভায়ী মানুষ প্রভৃতিতে মুখরিতদের উপাসনা পরিণত হয়ে এসেছে।

www.icsbook.info
আবার এ দেব পৃথিবীর চতুর্দিকে কল্পনা ও পৌরাণিকতার (Mythology) একটা তেলসমাতি জগত তৈরী করা হয়েছে। প্রত্যেকটি অধিকিত ও অজ্ঞাত এখানে তাদের উর্বর মক্ষক ও শিল্পকারিতার এমন সব অভ্যন্তর ও মজার মজার নমুনা পেশ করেছে যে, তা দেখে অবাক হতে হয়। যেসব জাতির মধ্যে প্রধান খোদা অর্থাৎ আল্লাহর ধর্ম সম্পর্কিত হয়েছে সেখানে আল্লাহ তার কর্তৃপক্ষকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেন আল্লাহ একজন ব্যাবধান এবং অন্যান্য খোদারা তার উজিজি-নাজির, দরবারী, মোসাহেব ও কর্মচারী প্রায়োজন, কিন্তু মানুষ সেই বাদশাহ নামচার পর্যায়ে পৌঁছতে অক্ষম, তাই অধীনস্থ খোদাদের মারফত যাবতীয় কার্যসম্পন্ন করা হয়, তাদের সংগেই সকল বাপারে সরাসরি সম্পর্ক। অন্যান্য যেসব জাতির মধ্যে প্রধান খোদার ধর্ম নিয়ম অঃস্পষ্ট বা একবারে নেই বললে হয়, সেখানে খোদার যাবতীয় কর্তৃত্ব বিনিময় শক্তিশালী লোকদের মধ্যে বস্তিত হয়েছে।

নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের পর এই দ্বিতীয় প্রকার জাহেলিয়াতটির স্থান। প্রাচীনতাহিতির যুগের থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ এর প্রাপ্তি ভেসে চলেছে। সবসময় নিম্নতম পর্যায়ের মানসিক অবস্থায় তারা এ পর্যায়ে নেমে আসে। খোদার নবীগণের শিক্ষার প্রভাবে সেখানে মানুষ একমাত্র পরাক্রমশীল খোদার কর্তৃত্বের সীমাকাঠি দিয়েছে, সেখানে অন্যান্য খোদার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে সত্য; কিন্তু নবী, গুলি, শ্বেত, দরবেশ, গন্ধ, কুতুব, গুলমা, পীর ও ঈর্ষেরর বর-পুত্রদের ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব তরুণ রূপে নিয়ন্ত্রণে ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে স্থানান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছে। অঙ্গ লোকরা মুসলিমদের খোদাগণকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর সেই নেতা বাদামদেরকে খোদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, যাদের সমগ্র জীবন মানুষের কর্তৃত্ব খাতে করে একমাত্র আল্লাহর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে বাধ্য হয়েছিল। একদিকে মুসলিমদের নয়া পৃথিবী অধ্যুরন পরিত্যাগ করে ফাতেহালানি, জওয়াত, নজরনিয়াজ, উরসা, চাঁদা চোরানো, তাজিয়া মন্ত্রণমূলক এবং এ ধরনের আরো অনেক ধর্মীয় কাজ সমাপ্ত করে একটি নতুন শরীয়ত তৈরী করা হয়েছে। আর অন্যান্য লোকেরা তত্ত্বাদিত দলিক-প্রমাণে ছাড়া ঐসব নেক লোকদের জন্ম-মৃত্যু, আবির্ভাব-তীর্বতাব, কাশক-করমান, কমতা-কর্তৃত্ব এবং আল্লাহর দরবারে তাদের নিকটস্থ ধরন সম্পর্কে পৌরাণিক মুসলিমদের পৌরাণিকবাদের সাথে সর্বক্ষণে সামঞ্জস্যশীল একটি পৌরাণিকবাদ তৈরী করা হয়েছে। তৃতীয়তম ‘ওসিলা’ ‘হাম্মে’ মস্ত’ ‘ফয়েজ’ প্রভূতি শব্দগুলোর সুদৃশ্য অবরোধের আড়ালে আল্লাহ ও বাদামর মধ্যকার যাবতীয় সম্পর্কে ঐসব নেক লোকদের সংগে জড়ে দেয়া হয়েছে। যেসব মুসলিমদের মতে বিশ্ব প্রভুর নিকট পৌঁছবার সাধা মানুষের নেই এবং মানুষের জীবনের
সংগে সমস্ত যাবতীয় বিষয় নীচের ত্রয়ো কর্মকর্তাদের সংগে জড়িত, কার্যত সেসব আরাহ অতিং স্বীকারকরী মূল্যবিন্যাসের মতো অবস্থা সেখানেও সৃষ্টি হয়। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, তারা এ নীচের কর্মকর্তাদেরকে প্রকাশে উপাসনা, দেবতা, অবতার অথবা ঈশ্বরের পুত্র বলে থাকে আর এরা গৌল্য, বুত্তব, আবাদাল, আলবিল্যা, আহলুব্বারা প্রভৃতি শব্দের আবরণে দেখেকে ঠেকে রাখে।

এ দ্বিতীয় ধরনের জাহেলিয়াতকে যুগে যুগে প্রথম ধরনের জাহেলিয়াত অর্থাৎ নির্ভর্জাল জাহেলিয়াতের সংগে প্রায়ই সহযোগিতা করতে দেখে গেছে। প্রাচীন যুগে ব্যাপিয়ে, মিশর, হিন্দুস্তান, ইরান, স্যার্ক, রোমে প্রভৃতি দেশের তাহজী-তমুলন এ দুটি জাহেলিয়াতের সহ অবস্থান ছিল। বর্তমান যুগে জাপানী সভ্যতা সংক্রান্তিরও একই অবস্থা। এ সহযোগিতার বিভিন্ন কারণ আছে, তার মধ্যে কয়েকটি আমি এখানে উল্লিখন করছি।

প্রথমতঃ শের্ক মিশ্রিত জাহেলিয়াতে মানুষের সংগে তার উপাস্যগণের সমর্থ হলো এই যে, সে তাদেরকে নিষ্কর্তৃপ্রশালী এবং লাভ ক্ষতির মালিক মনে করে এবং বিভিন্ন উপাসনা-আরাহনে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার পার্থিব উদেশ্যের সিদ্ধির ব্যাপারে এই উপাস্যগণের করুণা ও সাহায্য লাভ করার চেষ্টা করে। তাদের কাছ থেকে কোনো প্রকার নৈতিক নির্দেশনা বা জীবন- যাপন সমর্পিত আইন কানুন লাভের সম্ভাবনাই নেই। কেননা বাণিজ্যে সেখানে কোনো খোদা তাকে তবেই তো তিনি আইন ও নির্দেশ দিবেন। কাজেই এমন কোনো বস্তু যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে মূর্ধিকারা নির্ভরেই অবিবার্ত্তের একটি নৈতিক মতবাদ তৈরী করে এবং এ মতবাদের ভিত্তিতে তারা নির্ভরেই একটি শরীয়ত প্রণয়ন করে। এভাবে আসলে সেই নির্ভরজাহেলিয়াতকেই কর্তৃপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য নির্ভরজাহেলিয়াত ও শের্ক মিশ্রিত জাহেলিয়াতের তাহজী-তমুলনের মধ্যে এ ছাড়া অন্য কোনো পার্থক্য থাকে না যে, এক স্থানে জাহেলিয়াতের সংগে মন্দির পূজারী এবং নানান ধরনের পূজা ও বেদনার মূল্য প্রচলিত থাকে আর অন্যা স্থানে তা থাকে না। নৈতিক চরিত্র ও কর্মের ক্ষেত্রে উভয় স্থানে কোনো পার্থক্য নেই। প্রাচীন স্যার্ক ও পৌরাণিক গোমের নৈতিক প্রকৃতি ও চরিত্রের সংগে আজকের ইউরোপের নৈতিক প্রকৃতি ও চরিত্রে যে মিল দেখা যায়, তার কারণও এই একটি।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা, শিল্প, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির জন্য শের্ক মিশ্রিত মতবাদ কোনো পৃথক মূল্যবিন্যাস সরবরাহ করে না। এ অধ্যায়েও একজন মূর্ধিকার নির্ভরজাহেলিয়াতের পথেই পা বাড়ায়। এবং নির্ভরজাল
জাহেলিয়াতের সামাজিক আদর্শের পথেই মুশরিক সমাজের সমগ্র মানসিক ও চিন্তাগত বিকাশ ঘটে। পার্থক্য শুধু এইটেকু যে, মুশরিকদের কল্পনাশক্তি সীমাতিরিক্ত, তাদের চিন্তায় কল্পনা প্রবণতার অস্বাভাবিক আধিকা দেখা যায়। আর নাশিকরা হয় অনেকটা বাস্তবধর্মী, তাই কল্পনাতিতিক দর্শনের ব্যাপারে তাদের কোনো প্রকার অগ্রহ নেই। তবে এ নাশিকরা খোদা ছাড়াই যখন এ বিশ্বজগানের গ্র্য্যু খুলবার চেষ্টা করে, তখন তাদের যুক্তি প্রমাণের বহর ঠিক মুশরিকদের পৌরাণিকতার (Mythology) মতেই হাস্যরর ও অমূল্যিত হয়ে পড়ে। মোদলকথা হলো, শেষঃ ৫ নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের মধ্যে কার্যতঃ কোনো পার্থক্য নেই। আজকের ইউরোপ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সে তার আধুনিক মতবাদের সূচী প্রাচীন গ্র্যু ও রোমের সংগে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছে, যেন মনে হয় সে তাদের সত্তার।

তৃতীয়তরুণ নির্ভেজাল জাহেলী সমাজ যে সম্পত্তি মতুদুনিক পদক্ষে অবলম্বন করে, মুশরিক সমাজের সৌন্দর্য গ্রহণ করার জন্য পুরোপুরি অভ্যাস তুলে— যদিও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে শের্ক ও নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের পদক্ষে কিছুটা বিভিন্নতা আছে। শের্কের রাজত্বে বাদশাহদেরকে খোদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় নেতাদের একটি শ্রেণী বিশেষ সম্প্রদায়ের অধিকারী হয়। রাজবংশ ও ধর্মীয় নেতাদের দল সুলভিতভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। এক বিশ্ব ওপর অন্য বিশ্বের শেষে এক শ্রেণীর ওপর অন্য শ্রেণীর শ্রেষ্ঠতা ও প্রাধান্যের একটি স্থায়ী মতবাদ উদ্ভাবন করা হয়। বিপরীত পক্ষে নির্ভেজাল জাহেলী সমাজের এই দোরগুলো বিশ্ব পুণ্য জাতি পুণ্য জাতীয় সম্মুখের, একনায়কত্ব, পুণ্যজাতিও ও শ্রেণী সংঘাতের রূপ ধারণ করে। কিন্তু প্রাণসূচক ও মৌলিক প্রেরণার দিক দিয়ে মানুষের ওপর মানুষের প্রতিরুতি চাপিয়ে দেয়, মানুষের দ্বারা মানুষের খো-বিখো করা এবং মানবতাকে বিভক্ত করে এক শ্রেণীর জনসাধারণকে অন্য শ্রেণীর জনসাধারণের রক্তে পিপাসুতে পরিণত করার ব্যাপারে উভয়ই একই পর্যায়ের।

বৈরাগ্যবাদী জাহেলিয়াত

তৃতীয় অতিপ্রাকৃত মতবাদ বৈরাগ্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর সংক্ষিপ্তসার হলো।

এ পৃথিবী এবং এ পার্থিব অস্তিত্ব মানুষের জন্য কারাগারের শাস্তি বর্ধন। দেহ পিণ্ড আবদ্ধ মানুষের গ্রাণ আসলে একটি শাস্তিভোগী করে। সমস্ত আমোদ-আহলাদ, কামনা-বাসনা, প্রাণ ও দেহিক প্রয়োজন আসলে এ কারাগারের শিকল ও লোহার বৈদ্য মাত্র। মানুষ এ জগত এবং এর বহুনিচিয়ের
সংগে যতবেশী সম্পর্ক রাখবে, ততই আবর্জনায় তার সারা অংশ ভরে যাবে এবং ততবেশী শান্তিলাভের অধিকারী হবে। নাজাত ও মোক্ষ লাভের একটি মাত্র পথ আছে। এজন্য জীবনের যাবতীয় আন্দোলন-উদ্ধার থেকে সম্পর্কভূত হতে হবে। সমস্ত কামনা-বাসনাকে নির্মূল করতে হবে। সকল প্রকার ভোগ পরিহার করতে হবে। দৈহিক প্রয়োজন ও ইন্দ্রিয়ের দাবিসমূহ অবশিষ্ট করতে হবে। পারিবারিক বস্তু সমষ্টি এবং রক্ত মাংসের সম্পর্কের সাথে মুক্ত যাবতীয় মেহ-প্রেম-ভালোবাসাকে হদয় থেকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে হবে। সর্বোপরি নিজের দেহ ও ইন্দ্রিয়রূপ শক্তির তায় ও সাধনার মাধ্যমে পীড়ন করতে হবে এবং এত অধিক পরিমাণে পীড়ন করতে হবে যেন আমার উপরে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকতে না পারে। এভাবে আমার সৃষ্টি, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়ে যাবে এবং নাজাতের উন্নত স্বাস্থ্যমূলক উত্তীর্ণ হবার শক্তি অর্জন করবে।

এটি আসলে একটি অসামাজিক মতবাদ। কিন্তু সমাজ, সভাতা ও সংস্কৃতির ওপর বিভিন্নভাবে এ মতবাদ প্রভাব বিস্তার করে। এর ভিত্তিতে একটা বিশেষ ধরনের জীবন দর্শন গড়ে ওঠে।—তার বিভিন্ন রূপ বেদান্তবাদ, মনুবাদ, প্লোটোবাদ, যোগবাদ, তাসাক্ত, গৌরীর্মণ্য বৈরাগ্যবাদ ও বুদ্ধমত প্রভূতি নামে পরিচিত। এ দর্শনের সঙ্গে এমন একটি নৈতিক ব্যবস্থা অসত্য লাভ করে যা খুব কম ইতিবাচক এবং খুব বেশী বরং পুরোপুরি মৃত্যুবাচক হয়। এ দুটি বস্তু সম্মিলিতভাবে সাহিত্য, আদিতা-বিশ্বাস এবং নৈতিক ও কর্ম জীবনের মধ্যে অনুবর্তে করে। যেখানে তাদের প্রভাব পৌছায় সেখানে আক্ষরিক ও কোকেনের কাজ করে।

প্রথম দু ধরনের জাহেলিয়াতের সঙ্গে এ তৃতীয়ীয় ধরনের জাহেলিয়াতটি সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে সহযোগিতা করেঃ

(১) এ বৈরাগ্যবাদী জাহেলিয়াত সৎ ও ধর্মতীর্থ লোকদেরকে দুনিয়ার ঝুঁকে মুক্ত করে নির্জনিতীর্থ করে তোলে এবং দুই প্রকৃতির লোকদের জন্যে পথ পরিকাঠামো করে দেয়। অসৎ লোকেরা খোদার ধুঁকিয়ে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করে অবধি ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায় আর সৎ লোকেরা সন্ত্রাসের নাজাত ও মোক্ষ লাভের চিহ্নিত তপস্যা ও সাধনায় আত্মিয়োগ করে।

(২) এ জাহেলিয়াতের প্রভাবে জনগণের মধ্যে অবাকক্ষুদ্র ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি হয় এবং তারা তার সহজ শিকারে পরিণত হয়। এজন্য রাজা-বাদশাহ আমীর-ওমারি ও ধর্মীয় কর্তৃত্বাধিকৃত শ্রীনি হামেশা এ বৈরাগ্যবাদী দর্শনে নৈতিক আদর্শের প্রচার ও বিস্তারে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন। আর তাদের ছাপাছাড়া এ মতবাদ নিষ্ক্রিয় বিস্তারলাভ করেছে।
সাম্রাজ্যাবাদ, পুঁজিবাদ ও পোপবাদের সংগে এ বৈরাগ্যবাদী দর্শনের কোনোকলে কোনো সংঘাত হয়েছে বলে ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে না।

(৩) এ বৈরাগ্যবাদী দর্শন মানব প্রকৃতির নিকট পরাজিত হলে নানান রকমের বাহানা তালাশ করতে শুরু করে। কোথাও কাফ্ফারা দানের নীতি উদারন করা হয়। এতে করে একদিকে মনের আশা মিটিয়ে গোনাহ করা যায় আবার অন্যদিকে জান্নাততে হাতছাড়া হয় না। কোথাও ইন্দিয়ের সুখ চরিতার্থ করার জন্যে দেহকেশ্মার্ক প্রেমের বাহানা করা হয়। এর ফলে অতরের আশুনে ঘৃতাহুতিতে দেয়া হয় আবার সংগে সংগে ‘হজুরে আলার’ পাক-পরিবর্তার মধ্যে কোনো পাথক্যা সৃষ্টি হয় না। আবার কোথাও সংসার ব্যয়ের অন্তর্লে রাজা-বাদশাহ ও ধনিকদের সাথে যোগসাজ করে আধ্যাত্মিকতার জাল বিছানা হয়। এর জন্যযতম রূপ প্রদর্শন করেছেন রোমের পোপ সম্প্রদায় ও প্রাচ্য জগতের রাজা-বাদশাহগণ।

এ জাহেলিয়াত নিজের যৌগোত্রীয় সংগে এহেন ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু নবীগণের উমের মধ্যে এর অনুমিত আত্মকর্মের অন্তর্ভূত করে। খোদার দীর্ঘতম ওঝাল এর প্রথম আঘাত হলো এই যে, যে এ দুৈনিয়াকে কর্মস্থল, স্বরীন্দ্রশাঙ্গুলি ও পরিকল্পনার কৃষিক্ষেত্রের পরিবর্তে ‘দার্কাল আজার’ ও ‘মায়াজাল’ হিসেবে মানুষের সমক্ষে পেশ করে। দৃষ্টিহার্দের এ মৌলিক পরিবর্তনের কারণে মানুষ তুলে যায় যে, তাকে এ পৃথিবীতে খোদার প্রতিনিধি নিয়ূক্ত করা হয়েছে।

সে মনে করতে থাকে, ‘আমি এখানে কাজ করায় ও পৃথিবীর তার বিষয়াবলী পরিচালনা করার জন্যে আসিনি বর্ণ আমাকে আবর্জনা ও অপবিত্রতার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এ থেকে গা বাঁচিয়ে আমাকে দূরে দূরে রেখে থেকে হবে। আমাকে এখানে নাম-কোনাপার্টের হিসেবে থাকতে হবে এবং দায়িত্ব গ্রহণ করার পরিবর্তে তাকে অভিযুক্ত করতে হবে। ’ এ ধারণার ফলে পৃথিবী ও তার সমৃদ্ধ কার্যাবলী সম্পত্তি মানুষের মুখে যেন সংশয়ী ও সত্যত্ব হয়ে ওঠে এবং খোদার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব তো দূরগুলো কথা, সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

তার জন্যে শরীয়তের সমাজ ব্যবস্থা অধিকারী হয়ে পড়ে। ইবাদত-বদন্তী ও খোদার আদেশ নিষেধ যে পার্থিব জীবনের সংক্রান্ত ও খোদার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্যে মানুষকে তৈরি করে, এগুলোর এ অর্থ তাদের নিকট অগ্রসর হয়। বিপৃত্তির পক্ষে সে মনে করতে থাকে যে, ইবাদত-বদন্তী এবং কতিপয় বিশেষ ধর্মীয় কাজের পূর্ব মনোনয়নের
ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন

সংগে যথাযথ পরিমাপ করে সম্পাদন করা উচিত, তাহলেই আখ্রেতে নাজাত ও মোক্লাত করা যাবে।

এ মানসিকতা নবীগণের উম্মতের একটি অংশকে মোরাকারা, মোশাহাদা, কাশফ, রিয়াজাত, চিল্লাদান, অজিফ পাঠ, আমালিয়াত, মাকামাত সফর ও হাকিকত প্রভৃতির দার্শনিক ব্যাখ্যার, গোলক ধারায় নিক্ষেপ করেছে। তারা মুসাহার ও নফল আদায়ের ব্যাপারে ফরজের চাইতেও বেশী মনোযোগী হয়েছে। এভাবে খোদার যে প্রতিনিধিত্বের কাজ জারি করার জন্যে নবীগণ তারমুক এনেছিলেন, তা থেকে তারা পাল্লে হয়ে গেছে। অন্যদিকে আর একটি অংশের মধ্যে কাশফ ও কেরামত, দীনের নির্দেশের ব্যাপারে অথবা বাড়াবাড়ি, অর্থনীতি প্রশ্ন উপাদান, ছোট ছোট জিনিসকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিমাপ করা এবং খুঁটিনাটি ব্যাপারে অম্বাভাবিক মনোযোগ ও যত্ন নেয়ার রোপ জন্য নিয়েছে। এমনকি খোদার দীন তাদের নিকট এমন একটি হালকা কাঁচাপাত্র পরিণত হয়েছে, যা সামান্য কথায় বা সামান্য ব্যাপারে থাকাকে খেয়ে ভেসে গুঁড়া হয়ে যায়, ফলে তাদের মনে সবসময় সম্রাটবাবু বিরাজিত, যে একটি এদিক-ওদিক না হয়ে যায়, তাদের শীর্ষপরির রক্ষিত কাঁচাপাত্র যেন ভেঙে তুকরো তুকরো না হয়ে যায়—এ সম্রাটবাবু মধ্যেই তাদের সব সময় অতিবাহিত হয়। দীনের মধ্যে এ গভীর সৃষ্টিকর্তৃত্ব পথ প্রশস্ত হবার পর অনিবার্য হয়ে প্রথমে প্রথমে সৃষ্টিতে নিহিত, সংকীর্ণ চিন্তা ও স্বপ্ন হিতম সৃষ্টি হয়। তখন মানুষের মধ্যে উজ্জ্বল যোগাযোগের চিহ্ন বা কেমন করে অবশিষ্ট থাকতে পারে। পীরন্দ্রিয় পর্যবেক্ষণকারী দৃষ্টি দিয়ে মানব জীবনের বৃহত্তম সমস্যাবলীকে সে কিভাবে নিরীক্ষণ করতে পারে। কিভাবে ইসলামের বিশ্বজীবনী মূলনীতি ও খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে যুগের প্রতি তার আবর্তনে প্রতি নব পর্যায়ে সে মানবতাকে নেতৃত্বদান করতে পারে।

ইসলাম:

চতুর্থ অতিপ্রাকৃত মতবাদটি পেশ করেছে খোদার নবীগণ। এর সংক্ষিপ্তসার হলোঃ

আমাদের চতুর্থিকে পরিবাসিত এ সৃষ্টিকর্তৃত্ব, আমরা নিজেরাও এর একটি অংশ বিশেষ—আসলে এক সম্রাটের সাম্রাজ্য। তিনি একে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এর মালিক। তিনিই এর একমাত্র শাসক ও পরিচালক। এ সাম্রাজ্যে

1. আমালিয়াত—তার চাইতে বড় সে-আমলের পক্ষভুক্ত আজ পর্যন্ত মানুষ আবিষ্কার করতে পারেনি।
2. দুনিয়ার মাকামাত নয় হর্ষীয় মাকামাত—অধ্যায়িক জগত।
3. যেমন ধর্মন, সর্বেক্ষণবাদ।

www.icsbook.info
আর কারো হকুম চলে না, সবাই তাঁর নির্দেশের অনুগত আর সমস্ত ক্ষমতা পূর্বতন ঐ একজন মালিক ও শাসকের হাতে কেন্দ্রীতৃত।

এ সম্বন্ধে মানুষ জন্মত প্রজা। অর্থাৎ প্রজা হওয়া বা না হওয়া তার ইচ্ছা-নির্ভর নয়। বরং এ প্রজা হিসেবেই জন্মানো হবে এবং প্রজা ছাড়া অন্য কিছু হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

এ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষের স্বাধীনতা ও দায়িত্বীনতার কোনো অবকাশই নেই। প্রকৃতিতে তার হতে পারে না। জন্মত প্রজা এবং সাম্রাজ্যের একটি অংশ হওয়ার কারণে অন্যান্য অংশগুলো যেকোনো সমার্থের নির্দেশের আনুগত্য করেও তেমনি তাকে আনুগত্য করতে হবে, এছাড়া তার জন্যে বিদ্রুপী কোনো পথ নেই। এ নিজেই নিজের জন্যে জীবন বিধান তৈরী করার এবং নিজের কর্তারা নিজেই নিজের কার্যকর অধিকার রাখে না। তার একমাত্র কাজ হলো মালিকুল মুলক—সম্রাটের পক্ষ থেকে আগত প্রত্যেকটি নির্দেশ পালন করা। এ নির্দেশ আগমনের মাধ্যম হলো ‘ওহই’ আর যেসব মানুষের নিকট এ নির্দেশ আসে তারা হলেন নবী।

কিন্তু সে মহান প্রতু মানুষের পরিকার জন্যে সৃষ্টির পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। তিনি নিজে প্রচুর হয়ে গেছেন এবং তাঁর সম্রাজ্যের নির্দেশঘানাও পরিচালনায় যাতে বৃহত্তর ব্যবস্থাকেও প্রচুর করে রেখেছেন। এ রাষ্ট্র এমনভাবে চলছে যে, বাহারতে এর কোনো শাসন দৃষ্টিগতে হয় না, কোনো কর্মকর্তাতে দেখা যায় না। মানুষ শুধু দেখেছে, একটি কার্যকাল চালু আছে। তার মধ্যে সে নিজের অস্তিত্ব উপস্থিতি করছেন। সে কারো অধিনস্ত এবং কারোর নিকট তাকে হিসেব দিতে হবে, তার বাহাদুরিয়ের মাধ্যমে কোথাও এটা অনুভূত হয় না। চতুর্দিকের ব্যক্তিমতের মধ্যে এমন কোনো সুস্পষ্ট নিশাচীত্বই নেই, যার ভিত্তিতে বিষয়জাহানের শাসনকর্তার কর্তৃত্ব এবং নিজের অধিনতা ও দায়িত্বীনতার অবস্থা সকল প্রকার সমন্বয়ে প্রকাশিত হতে পারে এবং তা প্রকাশিত হবার পর তাকে স্বীকার করে নেয়া ছাড়া প্রত্যেক থেকে না। বলীদারের আগমন হয়, কিন্তু তাঁদের ওপর যে ওহি নামিল হয় তা কেউ চান্দুক্ত প্রত্যক্ষ করে না অথবা কোনো সুস্পষ্ট আলামতও তাঁদের সংগে প্রেরিত হয় না, যা প্রত্যক্ষ করার পর তাঁদের নবুধাত মেনে নেয়া ছাড়া প্রস্তাব থাকে না। আবার একটি সৃষ্টিকর্তা মধ্যে মানুষ নিজেকে পূর্ণ স্বাধীন দেখতে পায়। বিদ্রোহ করার ক্ষমতাও তাকে দেয়া হয়, এর যাতে উপকরণ সরবরাহ করা হয় এবং দীর্ঘকালীন যুগলো দেয়া হয়। এমনকি দৃষ্টিত্ব ও গোনাহের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছতে গিয়ে সে কোনো বাধা পায় না। মালিক ছাড়া অন্য কারোর বন্দী নদে
ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন

করতে চাইলে তাতেও বাধা দেয়া হয় না। এজন্যে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা হয়—যাকেই ইচ্ছা তার বন্ধী, দাসত্ব ও আনুগত্য করতে পারে। বিদ্রোহ করলে এবং অন্যের দাসত্ব করলে উভয় অবস্থাতেই রেজেকের মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হয় না, বরং বরাবর রেজেক লাভ করতে থাকে। জীবন-যাপনের যাবতীয় সরঞ্জাম, কর্মের উপায়-উপকরণ এবং আয়েশ-আরামের দ্বারা-সামগ্রী নিজের মানসিক উদ্দ্বেগ বেশ ভালোভাবেই লাভ করতে থাকে এবং আমূর্ত্ত্ব এ পাওয়া যেতে থাকে। কখনো কোনো খোদাদ্রোহী বা অন্যের দাসত্বকরীকে তার অপরাধের দরন্ত পার্থিব সাজসজ্জার এবং জীবন যাপনের যাবতীয় দ্বারা-সামগ্রী সরবরাহ করা বঙ্গ হয়নি। বিশ্বজাহানের মানুষের ব্যাপারে এ বিশিষ্ট কর্মক্ষমতা গৃহীত হয়েছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো এই যে, দ্বিতীয় মানুষকে বিকেক, বুদ্ধি, যুক্তিধর্মিত, আকাঙ্খা ও স্বাধীন ইচ্ছার যে ক্ষমতা দিয়েছেন এবং নিজের অসংখ্য সৃষ্টির ওপর মানুষকে যে এক ধরনের কর্তৃত্ব ক্ষমতা দান করেছেন, তার মাধ্যমে তিনি পরিক্ষা করতে চান। এ পরিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করার জন্য সত্যকে অদৃশ্য করে রেখেছেন—ভাবে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির পরিক্ষা হয়ে যাবে। মানুষকে নির্বচনের অধীন স্বাধীনতা দান করেছেন—ভাবে মানুষ সত্যকে জানার পর কোনো চাপ বা বাধ্যবাধকতা ছাড়াই বেঁধে এবং সাহায্য তার অনুগত হবে অথবা কামনার দাসত্ব গ্রহণ করে তা থেকে মূখ ফিরিয়ে নেবে, এ বিষয়টির পরিক্ষা হয়ে যাবে। জীবন-যাপনের সরঞ্জাম, উপায়-উপকরণ এবং কর্মের স্বয়ংগত দান না করা হলে তার মোক্ষতা ও আয়োজনের পরিক্ষা হতে পারে না।

এ পার্থিব জীবন একটি পরীক্ষাকাল। তাই এখানে কোনো হিসাব নেই, কোনো শাস্তি ও পুরস্কার নেই। এখানে যা কিছু দান করা হয়, তা কোনো সংক্রমের পুরস্কার নয় বরং পরীক্ষার সামগ্রী এবং যে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ আসে তাও কোনো অসৎ কর্মের শাস্তি নয় বরং যে প্রাকৃতিক বিধানের ওপর দুনিয়ার এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত প্রাধান্যে তাই আওতায় এগুলো সত্যসত্যঃ আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১ কর্মের আসল হিসাব, যাচাই-বাচাই এবং সে সম্পর্কে রায়দানের সময় আসবে এ পার্থিব জীবন শেষ হবার পর, তাই নাম আরোপ করে। কাজেই দুনিয়ায় যাকিছ কর্মকল প্রকাশিত হয়, তা কোনো পদক্ষেপের অথবা কোনো কর্মের ভুল বা নিভুল, ভালো বা মন্দ এবং গ্রহণযোগ্য বা পরিবর্ত্যনের মানদণ্ডের পরিণত হতে পারে না। আসল মানদণ্ড হলো আরোপকারী।

১. এর অর্থ এ নয় যে, এ দুনিয়ায় আদতে কোনো প্রতিভিকান্ত ব্যবহার কর্মকৃতি নেই। বরং যা অম্বুল চাইলে চাইল, তাহলে এই যে, এখানকার প্রতিভিকায় ও প্রতিভিত্ত ব্যবহারের, ধুমকেতু ও সুপ্রস্তুত নয় এবং পরীক্ষাকে নিকট সংবরকের পার্থিব শাস্তি ও পুরস্কারের ওপর কর্তৃক করণ। তাই এখানে যে কর্মফল প্রকাশিত হয় তাকে নেতিক্ষেত্রভাবে মেনে থাকা যায় না।

www.icsbook.info
ফলাফল। আখ্রেতাদের কোনো পদ্ধতি এবং কোনো কর্মের ফল ভাল বা মন্দ হবে, তার জন্য এককায় আলাদার পক্ষ থেকে নবীগণের ওপর অবতীর্ণ থেরিয়ম মাধ্যমে লাভ করা যেতে পারে। বিশ্বার্থতা আলোচনায় না পিয়ে সংকেতে বলতে গেলে আখ্রেতাদের লাভ-ক্ষতি যার ওপর নির্ভর করে তাহলে এই যে, প্রথমত, মানুষ নিজের সৃষ্টিমূর্তি ও যুক্তিবাদীর নিত্যুর ব্যবহারের মাধ্যমে আলাদা তা আলাই যে তার আসল শাসক তা জানতে পারে কিনা এবং তার পক্ষ থেকে যেসব নির্দেশ প্রেরণ করা হয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করতে পারে কিনা। দ্বিতীয়ত, এ সত্য অবগত হবার পর সে (নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও) সেই যুক্তির সাথে আলাদার কর্তৃত্ব এবং তার নির্দেশাবলীর সমস্যে আনুগত্যের শির নত করে কিনা।

সৃষ্টির প্রারম্ভকাল থেকে নবীগণ এ মতবাদ পেশ করে এসেছেন। এ মতবাদের ভিত্তিতে বিশ্বজাহানের হার্টফায়ার হাত্তানকারীর পূর্বাঙ্গ ব্যাখ্যা হয়। বিশ্বের দৃষ্টিব্যাপি বিষয়সমূহের সুপষ্ট অর্থ জ্ঞাত হওয়া যায়। কোনো পর্যবেক্ষণ বা পরিক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যমে এ মতবাদ তুল প্রমাণিত হয় না। এর ভিত্তিতে জাহানিয়াদের জীবন দর্শন থেকে মৃত্যুতাত্ত্বকে পৃথক একটি বতন্ত্ব জীবন দর্শন গড়ে ওঠে। এ জীবন দর্শন বিশ্বজাহান ও মানুষের অন্তিম সম্পর্ক বিপরীত বিপুলতর্কীয় জ্ঞানিয়াদের সম্পৃক্ত বিপরীত পদ্ধতিতে সংকলন ও পরিবর্তন করে। সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশ ও অগ্রগতির জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ তৈরী করে—জাহানিয়াত অনুসারে সাহিত্য-শিল্পের পথগুলো হয় তার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী।

জীবনের সমস্ত ব্যাপারে সে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সৃষ্টি করে—প্রাণশক্তি ও মৌলিকতার দিক দিয়ে জাহানিয়াত উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর সংগে তার কোনো সামগ্রিক নেই। সে একটি পৃথক নেতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করে—জাহানিয়াত নৈতিকতার সংগে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আবার এ তালিকা ও নেতিক বুনিয়াদের ওপর যে সভ্যতা-সংস্কৃতির গ্রাসার নিহিত হয়, তা হয় সমস্ত জাহানিয়াত সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য একটি পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ জাহানিয়াদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতিতে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। সারকাদা হলো এই যে, এ সভ্যতার শিরা-উপশিরায় যে প্রাণশক্তি সক্রিয়, তা এক সর্বময় কম্য়েটাসম্পন্ন শোধন কর্তৃত, আখ্রেতাদের বিষয়ে এবং মানুষের অধিনীতা ও দায়িত্বীতিতার কথা ঘোষণা করে। বিপরীত পক্ষ প্রত্যাক্ষটি জাহানিয়াত সভ্যতার সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে মানুষের অধিক স্বাধীনতা, বলগাহারা উচ্চঃশিক্ষা প্রবৃত্তি ও দায়িত্বীতিতার প্রেরণা অনুপ্রেরণ করে থাকে। তাই নবীগণের প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা-সংস্কৃতির মাধ্যমে মানবতার যে নমুনা তৈরী
হয় তার আকৃতি, প্রকৃতি, রূপ ও রং জাহেলী সভ্যতা-সংকৃতি সৃষ্ট নমুনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং এই পার্থক্য তার প্রতিটি অংশ ও প্রতিটি দিকেই সত্যিকার।

অতএব এর ভিত্তিতে তমুদুন্দ যে বিস্তারিত রূপলাভ করে তা সমগ্র দুনিয়ার অন্যান্য নকশা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে পড়ে। পবিত্রতা, পোশাক-পরিধান, খাদ্য, জীবন-যাপন পদ্ধতি, সামাজিক রীতি-নীতি, ব্যক্তি চরিত্র, জীবিকা উন্নতি, অর্থ ব্যয়, দাম্পত্য জীবন, সাংসারিক জীবন, বৈষ্ঠ নিয়ম-কানুন মানুষ ও মানুষের সম্পর্কের বিভিন্ন আকৃতি, লেন-দেন, অর্থ ব্যয়, রাষ্ট্র পরিচালনা, সরকার গঠন, রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ও দায়িত্ব, পরামর্শ পদ্ধতি, সংবিধান সংগঠন, আইনের মূলনীতি, মূলনীতির ভিত্তিতে রচিত বিস্তারিত বিধানাবলী, আদালত, পুলিশ, হিসাব-নিকাশ, কর, ফিনাস, নকলক্যাপ্সমূহক কার্যালয়, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সংবাদ সরবরাহ, শিক্ষা এবং অন্যান্য যাবতীয় বিভাগের নীতি, এমনকি সেনাবাহিনীর শিক্ষা ও সংগঠন এবং যুদ্ধ ও সন্ধির নীতিও এ তমুদুন্দে এক বিশেষ ও সত্যিকার সত্যায় অধিকারী। প্রতিটি অংশে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা তাকে অন্যান্য তমুদুন্দ থেকে আলাদা করে রাখে। প্রতিটি বিষয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য এবং একটি বিশেষ নৈতিক আচরণ সক্রিয় থাকে, যার সম্পর্ক থাকে এক ঘোষালা সার্বভৌম কর্তৃত্ব, মানুষের অধীনতা ও দাসত্ব এবং দুনিয়ার পরিবর্তে আখ্যাতের গতিব্যের সংগে।
মুজাদ্দিদের কাজ কি?

মুসলিম জাতির মুজাদ্দিদগণের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করার পূর্বে তারা যে তাজদীদ বা সংক্ষারমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করেন সে সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করা উচিত।

অভিনবত্ব ও সংক্ষারের মধ্যে পার্থক্য

সাধারণত অভিনব কাজ ও সংক্ষারমূলক কাজের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না এবং প্রত্যেক অভিনব কার্য সম্পাদনকারীকে সংক্ষারক বা মুজাদ্দিদ আখ্যা দেয়া হয়। মানুষের ধারণা, যে ব্যক্তি কোনো একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে জোরেশো তার প্রচলন শুরু করে, সেই মুজাদ্দিদ। বিশেষ করে যেসব লোক মুসলিম জাতির অবনতি প্রত্যক্ষ করে তাদেরকে জাগতিক দিক দিয়ে রক্ষা করার জন্যে প্রচেষ্টা চালায় এবং সমকালীন আধিপত্যশালী জাহেলিয়াতের সংগে আপেশ করে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের একটি অভিনব ‘মিশ্রণ’ তৈরী করে অথবা নিহত মুসলিম নামটি বাকী রেখে সমগ্র জাতিকে পূর্ণরূপে জাহেলিয়াতের রঙে রঙিত করে দেয়—তাদেরকে মুজাদ্দিদ আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। অথচ তারা মুজাদ্দিদ নয়, তারা অভিনব কার্য সম্পাদকারী 'মুতাজাদ্দিদ'। তারা কোনো সংক্ষারমূলক কাজ করে না, নতুন কোনো কাজ তাদের দ্বারা সাধিত হয় মাত্র। আর মুজাদ্দিদের কাজ এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। জাহেলিয়াতের সংগে আপেশ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করার নাম সংক্ষার নয়। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের অভিনব মিশ্রণ তৈরী করাও কোনো সংক্ষারমূলক কাজ নয়। বরং ইসলামকে জাহেলিয়াতের দৃষ্টি পানি থেকে ছেকে পূর্থক করে নিয়ে কোনো না কোনো পর্যায়ে তাকে তার সত্যিকার নির্ভর্জাল আকৃতিতে পুনর্বার অর্ধস্ফল করার প্রচেষ্টা চালানেই মুজাদ্দিদের কাজ। এদিক দিয়ে মুজাদ্দিদ হন জাহেলিয়াতের ব্যাপারে কাঠের আপেশহীন মনোভাবের অধিকারী। জীবনে নগন্যতম অংশেও তিনি জাহেলিয়াতের অস্তিত্বের সমর্থন নন।

মুজাদ্দিদের সংজ্ঞা

মুজাদ্দিদ নবী নন, কিন্তু তাঁর প্রকৃতি নরুয়াতের প্রকৃতির অনেক নিকটতর। মুজাদ্দিদ হন ব্যক্তি বিভাগ অধিকারী। সত্তা উপলব্ধি করার মতো গৌরবের দৃষ্টি তাঁর সহজত। সব রকমের বর্ণনা দোষমূলক সন্দেহ বুদ্ধিমূল্যে তাঁর মনোভাবে পরিপূর্ণ। প্রাক্তনতার বিপদমূলক হয়ে মধ্যম পল্লী অবলম্বনের পরিনিঃস্ফূর্তে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করার বিশেষ মোক্ষতা তাঁর বৈশিষ্ট্য। নিজের পরিবেশ এবং শতাধিক পুজীবৃত্ত ও প্রতিষ্ঠিত বিবেচনামূলক হয়ে চিত্তা করার শক্তি, যুগের
বিকৃত গতিধারার সাঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা ও সাহস, নেতৃত্বের জন্য গোপনীয় এবং ইজ্জতিহাদ ও পুনর্গঠনের অসমাধান ক্ষমতা মুজাদর্দের স্বাভাবিক ক্ষমতায় বসন্ত। এ ছাড়াও ইসলাম সম্পর্কে তিনি হন বিদ্রোহী পরিপূর্ণ আমের অধিকারী। দৃঢ়ভাবী ও বুদ্ধি-জানের দিক দিয়ে তিনি হন পূর্ণ মুসলমান। সুন্নি থেকে সুমধুর অনুভূতি ব্যাপারে ইসলাম ও জাহিদিয়াতের মধ্যে পার্থিক করা এবং অনুসন্ধান চালিয়ে দীর্ঘকালের জটিল আবার থেকে স্তরে উঠিয়ে নেয়া মুজাজ্দিদের কাজ। এসব বিষয়ের অধিকারী না হলে কেন ব্যক্তি মুজাজ্দিদ হতে পারে না। আর এইসব গুরুত্বের মধ্যে থাকে, তবে যেখানে থাকে এর চাইতে অনেক বেশি হাতে।

মুজাজ্দিদ ও নবীর মধ্যে পার্থিক করা

কিন্তু একটি মানুষিক বিষয় মুজাজ্দিদ ও নবীর মধ্যে পার্থিক সৃষ্টিকের। নবী ঐশ্বরিক নির্দেশে তাঁর পথে নিযুক্ত হন। তিনি নিজের নিয়োগ সম্পর্কে অবস্থান থাকেন। তাঁর নিকট ‘ওহি’ নামিল হয়। নবুরাতের দাবীর মাধ্যমে তিনি নিজের কাজের সূচনা করেন। তিনি মানুষকে নিজের দিকে আহ্বান করেন। তাঁর দাবীতে প্রাদেশিক হতে যা না করার ওপর মানুষের মুমিন ও কাফের হওয়ার সন্ধান দাবী। বিপরীত পক্ষে মুজাজ্দিদ এর মধ্যে কোনো একটিরও অধিকারী নন।

মুজাজ্দিদ যদি নিযুক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে হন প্রাকৃতিক আইনের মাধ্যমে— খোদার নির্দেশে নয়। অনেক সময় নিজের মুজাজ্দিদ হওয়া সম্পর্কেও তিনি অবগত থাকেন না। বরং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জীবনের কার্যক্ষেত্র পর্যালোচনা করে মানুষ তাঁর মুজাজ্দিদ হওয়া সম্পর্কে জানতে পারে। তাঁর ওপর ইহুদি (খোদার পক্ষ থেকে মনের মধ্যে তত্ত্বাবধানের উল্লম্ব) হওয়া অপরিহার্য নয়। আর ইহুদি হলেও সে সম্পর্কে যে তিনি অবশ্যই সচেতন থাকবেন, এমন কোনো কথাও নেই। তিনি কোনো দাবীর মাধ্যমে নিজের কাজের সূচনা করেন না এবং এমন করার অধিকারও তাঁর নেই। কোনো তাঁর উপর ইমাম আনা বা না আনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর মুসলিম সকল সৎ ও উন্নত চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিগত ও বীরের তাঁর চতুর্দিকে একত্রিত হয়। কেবল সেই সকল লোক তাঁর থেকে পৃথিবী থাকে, যাদের প্রকৃতি কোনো প্রকার বংশীয়তা দেখে দুঃখ। কিন্তু তবুও মুসলমান হওয়া তাঁকে বীরত্ব করে নেয়ার শর্ত সাপেক্ষে নয়। ১ এ সমস্ত পার্থিকসহ মুজাজ্দিদকে মোটামুটিভাবে নবীর পর্যায়ের কাজই করতে হয়।

1. অনেকে এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন করেন যে, মুজাজ্দিদগণের মধ্যে সেই কেউ তাঁদের মুজাজ্দিদ হওয়ার দাবী করেছেন। যেমন, মুজাজ্দিদ আলহাফিন (র) ও শাহ হাফিজুল্লাহ (র)। কিন্তু তাঁরা তুলে ধরেছেন যে, এই প্রকারের মুজাজ্দিদের কেবল কিছুদের এ স্পেসে অতিক্রান্ত হবার কথাই প্রশ্ন করছে। তাঁরা কোনো দাবী লেখায় নির্দেশ করেননি। তাঁদের কোনো কাজ থেকে একটি প্রমাণ না যে, তাঁরা মানুষকে নিজেদের দিকে আহ্বান করেছেন এবং নিজেদেরকে মুজাজ্দিদ বলে মনে মনের দাবী তাঁদিনামেন। অথবা তাঁরা এই গুলো বলেননি যে, যে তাদেরকে মুজাজ্দিদ বলে মনে মনে, কেবল সেই মুমিন হবে এবং নজর লাগ করবে।
মুজাদ্দিদের কাজ

মুজাদ্দিদের কাজের নিম্নলিখিত বিভাগসমূহ উল্লেখযোগ্য:

১. নিজের পরিবেশের নির্ভুল চিত্রাংকন। অর্থাৎ পরিস্থিতি পূর্ণরূপে পর্যালোচনা করার পর জাহালিয়াত কোথায় কতটুকু অনুপ্রেরণ করেছে, কেন্ পথে তার আগমন হয়েছে, তার শিকড় কোথায় এবং কতদূর বিস্তৃত, ইসলামের অবস্থা বর্তমানে কোন পর্যায়ে এসব সঠিকভাবে বুঝে নেয়া।

২. সংস্কারের পরিকল্পনা প্রণয়ন। অর্থাৎ বর্তমানে কোথায় আঘাত করলে জাহালিয়াতের বাধ্য টুকে যাবে এবং ইসলাম পুনর্বাণ সমাজ জীবনের ওপর কর্তৃত্ব করার চেষ্টা পাবে, তা নির্ধারণ করা।

৩. নিজের সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ। অর্থাৎ নিজে কতটুকু শক্তির অধিকারী এবং কোন পথে সংস্কার করার শক্তি তার আছে, এ সম্পর্কে নির্ভুল আদাজ করা।

৪. চিন্তারাজ্যে বিশ্ব সৃষ্টির প্রচেষ্টা। অর্থাৎ মানুষের চিন্তাধরা পরিবর্তন করা, আদা-বিশ্বাস, চিন্তা ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে ইসলামের ছাঁচে গড়ে তোলা, শিক্ষা ও অনুশীলন ব্যবস্থার সংস্কার করা, ইসলামী শিক্ষাকে পুনর্ক্রিয়াবিদ্যায় করা এবং সামাজিকভাবে ইসলামী মানসিকতাকে নতুনতায় উদ্ভিদিত করা।

৫. সক্রিয় সংস্কার প্রচেষ্টার। অর্থাৎ জাহালী রসম-রেওয়াজসমূহ খতম করো দেয়া, নৈতিক চরিত্র ও সৃষ্টিভঙ্গীশীল পরিচ্ছন্ন করা, মানুষের মধ্যে পুনর্বাণ শ্রীয়তার অনুগততার প্রবল প্রেরণা সৃষ্টি করা এবং পূর্ণ ইসলামী নেতৃত্ব দানের মতো লোক তৈরী করা।

৬. দীর্ঘায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইজ্জতি হার করার প্রচেষ্টা। অর্থাৎ দীর্ঘায় মূল্যবিন্যস্ত হয়নি করা, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমকালীন তমুখানিক পরিস্থিতি ও তমুখানিক উন্নতির নির্ভুল দিক নির্ধারণ করা এবং শ্রীয়তের মূল্যবিন্যাস আদায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তমুখানের নবজাত নক্ষত্র পরিবর্তনের এমন পদ্ধতি নির্ধারণ করা, যার ফলে শ্রীয়তের প্রকাশন অবিকৃত থাকে, তার উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হয় এবং তমুখানের নির্ভুল উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলাম দুনিয়াকে নেতৃত্ব দান করতে সক্ষম হয়।

৭. প্রতিরক্ষামূলক প্রচেষ্টা। অর্থাৎ ইসলামকে দাবির দিতে বা নিচিহ্ন করতে উদ্দেশ্য রাজনৈতিক শক্তির মোকাবিলা করা এবং তার শক্তি নির্ভুল করে ইসলামের বিকাশের পথ প্রস্তু করা।
৮. ইসলামী ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন। অর্থাৎ জাহেলিয়াতের হাত থেকে কর্তৃত্বের চারিধিক ছিনিয়ে নিয়ে পুনর্বার সরকারকে সেই ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা, যাকে নবী করিম সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম ‘বিলাফত’ নামে আখ্যায়িত করেছেন।

৯. বিশ্বজনীন বিপ্লব সৃষ্টি। অর্থাৎ একটি মাত্র দেশে অথবা যেসব দেশে মুসলমান পূর্ব থেকেই আছে কেবল সেখানেই ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত না হওয়া। বরং এমন একটি শক্তিশালী বিশ্বজনীন আন্দোলন সৃষ্টি করা, যার ফলে ইসলামের সংস্কারমূলক ও বিপ্লবী দাওয়া সাধারণে বিস্তার লাভ করে, ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমগ্র দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়, সমগ্র দুনিয়ার তমুত্তরিক্ষ ব্যবস্থায় এক ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি হয় এবং মানব জাতির নৈতিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ইসলামের হাতে কেন্দ্রিত হয়।

এই বিভাগগুলো গতিরভাবে পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, ইসলামী পুনরুজ্জীবনের কার্য সম্পাদক্ষরায় যাত্রিদের জন্যে প্রথম বিভাগ তিনটি অপরিহার্য। কিন্তু অবশ্যই এই বিভাগের প্রত্যেকটি মুজাজ্জিদ হবার অপরিহার্য শর্তের মধ্যে গণ্য নয়। বরং এগুলোর মধ্যে থেকে কোনো একটি, দু'টি, তিনটি, চারটি বিভাগে উল্লেখযোগ্য কার্য সম্পাদন করলে তাঁকে মুজাজ্জিদ গণ্য করা যেতে পারে। তবে এ ধরনের মুজাজ্জিদ আংশিক মুজাজ্জিদ হবেন। পূর্ণ মুজাজ্জিদ কেবল তিনিই হবেন, যিনি উল্লিখিত বিভাগের প্রত্যেকটিতে পূর্ণ কার্য সম্পাদন করে নবীদের উত্তরাধিকারিত্বের হক আদায় করবেন।

কামেল বা আদর্শ মুজাজ্জিদ

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখনো কোনো কামেল মুজাজ্জিদের আবির্ভাব ঘটেনি। হয়তো উমর ইবনে আবদুল আরীয় (র) এ মাত্র দেশে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি সফলকাম হতে পারেননি। তাঁর পর বর মুজাজ্জিদ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকে কোন একটি বিশেষ বিভাগে অথবা একাধিক বিভাগে কাজ করেছেন। কামেল মুজাজ্জিদের স্থান এখনো শুন্য আছে। কিন্তু বিবেক-বুদ্ধি, মানব-প্রকৃতি ও বিশ্ব পরিস্থিতি এমনি একজন ‘নেতা’র জন্য দারী করে। তিনি এ যুগে অথবা যুগের হাজারো আবর্তনের পর জন্মান্তভ করতে পারেন। তাঁরই নাম ইমামুল মেহদী। নবী করিম (স) হাদিসে তাঁরই সমক্ষে সুপ্রস্তুত বিভিন্ন বাণী করেছেন।

২. যদিও বিভিন্ন গুলো মুসলিম, তিরিমিত ইব্রেন মাজা, মুসলমানদের প্রতি বিভিন্ন প্রতিকী বিভিন্ন ভাবতেনভাবতে উল্লিখিত হচ্ছে, তবুও ইমাম শাহরীর (র) ‘মাওয়াফিকাত’ কিংবা এবং মাওলানা ইসমাইল শাহীদ (র) তাঁর ‘মানবের ইমামত’ কিংবা যে হাদিস বর্ণনা করেছেন এখানে তাঁর উল্লেখ লাগানো হবে।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্বিতীয়)
আমি বলতে পারি না সনদের দিক দিয়ে হাদিসটি কোন পৰ্যায়ের । কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে হাদিসটি এ সম্পর্কে বর্ণিত অন্যান্য সকল হাদিসের সংগে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণে। এ হাদিসটিতে ইতিহাসের পাচটি পৰ্যায়ের দিকে ইশারা করা হয়েছে । তার মধ্যে তিনটি পৰ্যায় অতিক্রম হয়ে গেছে এবং চতুর্থ পৰ্যায়টি বর্তমানে চলছে । শেষের যে পঞ্চম পৰ্যায়টি সম্পর্কে ভবিষ্যত্তিত করা হয়েছে, সমস্ত আলাদায় একথা ঘোষণা করছে যে, মানুষের ইতিহাস তুলনা সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে । মানুষের গড়া সমস্ত মতবাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং তা জীবনভাবে ব্যর্থও হয়েছে । বর্তমানে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত মানুষের ইসলামের দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গতান্তর নেই।

আজকাল অনেকেই অজ্ঞতাবশত এ নামটি শুনেই নাসিকা কুঠি করে থাকেন । তাদের অন্যতম, ভবিষ্যতে আগমনকারি ‘মর্ড কামেল’-এর প্রতীক্ষায় অজ্ঞ-অশিক্ত মুসলিমদের কর্মশক্তি জড়প্পূর্ণ হয়েছে । তাই তাদের মতে যে সত্যের ভূল অগ্রহণ করে অশিক্ত লোকেরা নিকটস্থি হয়ে যায় তার আদেশ সত্য হওয়াই উচিত নয় । উপরেতু তারা এর বলে যে, প্রত্যেকটি ধর্ম

তাই তারা বলে, এই পৰ্যায়ে মানুষের জীবনে এক যুগল সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের দীর্ঘ ইতিহাসের মাধ্যমে এবং তা তাদের মধ্যে থাকে— ভূমির জীবন আন্দাজ চূড়ান্ত হয়েছে । তারপর মহান আল্লাহ তা উদ্দীনে নেবেন । তারপর মহানের পূজা থেক্ষতে থিলাফত পরিলক্ষিত হবে— মতবাদ অল্পর্যায় চূড়ান্ত হয়েছে । তারপর আল্লাহ তাও উদ্দীনে নেবেন ।

তারপর তিনি তার মন্ত্রণালোক বুঝতে এবং তার বুঝতে তিনি চাইবে, তত্ত্বানুসারে তার সঙ্গে বুঝতে তার মন্ত্রণালোক বুঝতে এবং তাঁকের সঙ্গে বুঝতে তার মন্ত্রণালোক বুঝতে ।

“তোমাদের স্বাধীনতার আচরণ নূরুয়াত ও রহমতের মাধ্যমে এবং তা তোমাদের মধ্যে থাকবে— যত ক্ষণ অল্পর্যায় চূড়ান্ত হয়েছে । তারপর মহান আল্লাহ তা উদ্দীনে নেবেন । তারপর নূরুয়াতের পদক্ষেপ থেকে থিলাফত পরিলক্ষিত হবে৷ মতবাদ অল্পর্যায় চূড়ান্ত হয়েছে । তারপর আল্লাহ তাও উদ্দীনে নেবেন ।

তারপর তিনি তার মন্ত্রণালোক বুঝতে এবং তার বুঝতে তিনি চাইবে, তত্ত্বের সঙ্গে তার সঙ্গে বুঝতে তার মন্ত্রণালোক বুঝতে এবং তাঁকের সঙ্গে বুঝতে ।

“তোমাদের স্বাধীনতার আচরণ নূরুয়াত ও রহমতের মাধ্যমে এবং তা তোমাদের মধ্যে থাকবে— যত ক্ষণ অল্পর্যায় চূড়ান্ত হয়েছে । তারপর মহান আল্লাহ তা উদ্দীনে নেবেন । তারপর তিনি তার মন্ত্রণালোক বুঝতে এবং তার বুঝতে তিনি চাইবে, তত্ত্বানুসারে তার সঙ্গে বুঝতে তার মন্ত্রণালোক বুঝতে এবং তাঁকের সঙ্গে বুঝতে ।”

www.icsbook.info
বিশ্বাসী জাতির মধ্যে কোনো না কোনো “আদৃশ্যালোক হতে আগমনকারী ব্যক্তি” সম্পর্কিত বিশ্বাসের অভিযুক্ত আছে। কাজেই এটি নিহত একটি ব্যাপ্তি যার ধারণা। কিন্তু আমি বুঝি না শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুহাম্মদ (স)-এর নায় অন্যান্য নবীগণও যদি নিজেদের জাতিদেরকে এ সু-সংবাদ দিয়ে গিয়ে থাকেন যে, মানব জাতির পার্থিব জীবন শেষ হবার আগে ইসলাম একবার সমগ্র পৃথিবীতে পরিবাহ হবে এবং মানুষের রচিত সমস্ত ‘ইজমার’ ব্যবধানের পর অবশেষে বিপর্যস্ত ও দূর্দান্ত মানুষ খোদার রচিত এ এইজমার ছায়াতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হবন এবং খোদার এ দান মানুষ এমন এক বিরাট ও মহান নেতার বদলেতে লাভ করবে, যিনি নবীদের পদ্ধতিতে কাজ করে ইসলামকে তার নির্বল আকৃতিতে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করবেন, তাহলে তাতে ভাষ্য ধারণার অবকাশ কোথায়? সকল নবীদের বাণী থেকে পৃথক হয়ে এ বিষয়টি দুর্নিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এবং অজ্ঞতার কারণে মানুষ তাকে তার আসল ধ্যান-ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাষ্য ধারণার আবরণে জড়িয়ে ফেলেছে।

ইমাম মেহদী

মুসলমানদের মধ্যে যারা ইমাম মেহদীর আগমনের ওপর বিশ্বাস রাখেন তারা যথেষ্ট বিভাব্দির মধ্যে অবস্থান করছেন এবং তাদের বিভাব্দি এর প্রতি বিশ্বাসী নতুন প্রথা প্রবর্তনকারী মুহাম্মদ মুহাম্মদ থেকে কোনো অংশে কম নয়। তারা মনে করেন, ইমাম মেহদী পুরাতন যুগের কোনো সুফী ধরনের লোক হবেন। তাদের হাতে নিয়ে অন্তর্দিক কোনো মাদাসা বা খানকাহ থেকে বের হবেন। পারে এই এসই ‘আনাল মেহদী’-আমিই মেহদী বলে চোরিচোরকে ঘোষণা করে দেবেন। খোলাও ও শয়নকখন কিছু-পুত্র বলে দাবিদের নিকট পৌছে যাবেন এবং সেন্টিং চিহ্নমুখের সঙ্গে তার দেহের গঠন প্রকৃতি মিলিয়ে দেখুন তার চিনে ফেলবেন। হতে তাতে চিনে ফেলবেন। অতপর ‘বাইয়াত’ গৃহ শুরু হবে এবং জিহাদের এলান করা হবে। সাধারণত ধারবেশ এবং পুরাতন ধরনের গৌর্ণ ধর্ম বিশ্বাসীরা তাঁর পতাকাতলে সমবেত হবেন। নেহাত শর্ত পূর্ণ করার জন্য নামাত্ত তলোয়ার ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে, নয়তো আসলে বরকত ও আধ্যাত্মিক শক্তিবলেই সব কাজ সমাধা হয়ে যাবে। দোয়া-দরদ-জেকর-তসবির জোরে যুদ্ধ জয় হবে। যে কাফেরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে সেই তড়পাতে তড়পাতে বেঁচে যাবে এবং নিখুঁত বদলোয়ার প্রভাবে টাংক ও জংগী বিমানসমূহ ধংস হয়ে যাবে।

মেহদীর আবিষ্কার সম্পর্কে সাধারণ লোকদের মধ্যে অনেকটা এ ধরনের বিশ্বাসের অভিযুক্ত পাওয়া যায়। কিন্তু আমি যা অনুধাবন করেছি, তাতে দেখছি ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো। আমার মতে আগমনকারী ব্যক্তি তার নিজের যুগের
একজন সম্পূর্ণ আধুনিক ধরনের নেতা হবেন। সমকালীন সকল জান-বিজ্ঞান তিনি হবেন মুজতাহিদের ন্যায় গতীর জান সম্পন্ন। জীবনের সকল প্রধান সমস্যাকে তিনি ভালভাবে উপলব্ধি করবেন। রাজনৈতিক প্রজা ও বিচক্ষণতা এবং যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতার দিক দিয়ে সমস্ত বিষয়ে তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করবেন এবং সকল আধুনিকতার চাইতে বেশী আধুনিক প্রমাণিত হবেন। আমার আশ্চর্য হয়, তাঁর 'নতুনত্বের' বিরুদ্ধে মৌলিক ও সুফী সাহেবরাই সবার আগে চিত্তকার শুরু করবেন। উপরন্তু আমার মতে সাধারণ মানুষের থেকে তাঁর দৈহিক গঠন ভিন্ন রকমের হবে না এবং নিশ্চিন্ত দেখে তাকে চিহ্নিত করাও যাবে না। এবং তিনি নিজের মেহধি হবার কথাও ঘোষণা করবেন না। বরং হয়তো তিনি নিজের জানবেন না যে, তিনিই মেহধি। তাঁর মৃত্যুর পর সভ্যতার তাঁর কার্যকলাপ গ্রন্থকার মানুষ জানবে যে, তিনিই ছিলেন নবুওয়াতের পবিত্রতাতে থিলাফত প্রতিষ্ঠাকারী মেহধি। এতদিন তাঁরই আগমনের সুসংবাদ জানানো হয়েছিল।

ইতিপূর্বে আমি বলেছি যে, দাবীর মাধ্যমে কার্যকর করার অধিকার নবী ছাড়া আর কারো নেই এবং নবী ছাড়া আর কেউই নিশ্চিতভাবে জানেন না যে, তিনি কোনো খেদমতে নিযুক্ত হয়েছেন। 'মেহধিরাম' দাবী করার জিনিস নয়, কাজ করে দেখিয়ে দিয়ে যাবার জিনিস। এ ধরনের দাবী যারা করেন এবং যারা তাঁর ওপর ঈমান আনেন, আমার মতে, তাঁরা উভয়ই নিজেদের জানের স্বন্ত ও নিষ্ক্রিয়তার মানসিকতার পরিচয় দেন।

মেহধির কাজের ধরন সম্পর্কে আমি যতটেকু ধারণা রাখি, তাও এসব লোকের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাঁর কাজের কোনো অংশে কেরামতি, অন্যায়বিকায়া, কাশফ, ইলহাম, চিন্তা ও মুজাহাদা-মুরাকাবার কোনো স্থানেই আমি দেখি না। আমি মনে করি, একজন বিপুল নেতাকে যেভাবে এ দুনিয়ায় দুর্দশা, সংঘাত ও প্রচেষ্টার পর্যায়ে অতিক্রম করতে হয়, অনুরূপভাবে মেহধীকেও সেইসব পর্যায়ে অতিক্রম করতে হবে। তিনি নির্ভরজাল ইসলামের ভিত্তিতে একটি নতুন চিত্রাঙ্গ (School of Thought) গড়ে তুলবেন। মানুষের চিন্তা ও মানসিকতার পরিবর্তন করবেন। একটি বিপুল শক্তির আদেশে গড়ে তুলবেন। এ আদেশের একই সংগে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন হবে। জাহেলিয়া তাঁর সমন্ত শক্তি দিয়ে তাকে পিষে ফেলতে চাইতে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে জাহেলিয়ার কর্তৃত্বে উলটিয়ে দূরে নিকেপ করবে এবং একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করবে। এ রাষ্ট্র একদিকে ইসলামের পূর্ব দিকে অন্য একদিকে ইসলামের অন্তর্গত।

3. এ হাতে বেসর সম্পর্কে অবতরণ করা হয়, কিন্তু পরিষ্ঠিত অংশে তার জীবন দেখা হয়েছে।
প্রাণশক্তি কর্মতৎপর হবে আর অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক উন্নতি চরম পর্যায়ে উপনীত হবে। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বলা হয়েছে যে, “আর শাসনে আকাশ ও পৃথিবী উভয় স্থানের অধিবাসীরা সত্ত্বৃত হবে। আকাশ বিপুলভাবে তাঁর বরক্তসমূহ নাযিল করবে এবং পৃথিবী তাঁর পেটে রক্ষিত সমস্ত সম্পদ উদ্ধীরণ করবে।”

ইসলাম একদিন সমগ্র দুনিয়ার চিষ্টাধারা, তমুদনু ও রাজনীতির ওপর বিপুলভাবে গ্রহণ বিস্তার করবে, এ আশা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে এমন একজন বিরাট নেতার জন্মক্ষমতা নিষ্ঠিত যার সর্বব্যাপী ও শক্তিশালী নেতৃত্ব এ বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবে। যারা এ ধরনের নেতার আবির্ভাবের কথা শনে অবাক হন, তাদের বুদ্ধিবৃত্তি দেখে আমি অবাক হই। খোদার এ দুনিয়ায় যদি লেনিন ও হিটলারের মতো মিথ্যাচারী নেতার আবির্ভাব হতে পারে, তাহলে একজন সত্য ও হেদায়েতের ইমামের আবিশ্বাসকে সুদূর রাখতে মনে করা হচ্চে কেন?

নবীদের মিশন

এই সভ্যতা-সংস্কৃতির পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধারাবাহিকভাবে নবীগণকে প্রেরণ করা হয়েছিল।

বৈরাগ্যবাদী সভ্যতাকে বাদ দিলে অন্য যে সমস্ত জাহালিয়াত বা ইসলাম ভিত্তিক সভ্যতা জীবন সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শের ধারক ও দুনিয়ার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে একটি সর্বব্যাপী পদ্ধতির অধিকারী, তারা স্বভাবতঃ কর্তৃত্ব, ক্ষমতা দখল, শাসন ক্ষমতা হ্রাসে গ্রহণ এবং নিজের মনের মত করে জীবনের নকশা তৈরী করতে চায়। রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়াই কোনো বিধান ও মতবাদ পেশ করা অথবা তার ভক্ত হওয়া নিষ্ঠাতৃষ্ট অর্থহীন। সংসার বৈরাগী তো দুনিয়ার ব্যবস্থা পরিচালনা করতেও নারাজ। বরং এক বিশেষ ধরনের ‘সুলুক’—পদ্ধতির মাধ্যমে সে সাইকে থেকে নিজের কার্যকর নাজাতের মজ্জিলে পৌছে যাবার চিন্তায় মগু থাকে। তাই সে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের প্রয়োজন বোধ করে না এবং তা চাইও না। কিন্তু যে সভ্যতা দুনিয়ার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে এক বিশেষ পদ্ধতির দাবীদার এবং এই পদ্ধতির অনুসরণের মধ্যে মানবতার কল্যাণ ও নাজাত মনে করে, তার কর্তৃত্বের চারিকাঠি হস্তগত করার জন্যে প্রচেষ্টা চালানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। কেননা নিজের নকশাকে কার্যকরী করার শক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত তাঁর নকশা বাস্তব জগতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বরং তা মানুষের মনে এবং কাগজের বুকেও বেশীক্ষণ অবস্থান করতে পারে না। যে সভ্যতার হতে কর্তৃত্ব থাকে, দুনিয়ার সমস্ত কার্যক্ষেত্রের তাঁরই নকশা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সে জ্ঞান, বিজ্ঞান, চিত্তা, শিক্ষা ও সাহিত্যকে পথ প্রদর্শন করে।

সে নৈতিক চরিত্রের কাঠামো তৈরী করে। সে সাধারণ শিক্ষা ও অনুশীলনীর

www.icsbook.info
আয়োজন করে। তার বিধানের ভিত্তিতে তমুদুনের সময় ব্যবস্থা গড়ে উঠে।
তারই নীতি জীবনের সকল বিভাগে সক্রিয় থাকে। এজন্যে যে সভাতার
নিজের কোনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নেই, জীবনের কোথাও তার জন্যে একটিও স্থান
নেই। এমনকি দীর্ঘকাল বিজয়ী সভাতার প্রবল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকাকারে
বিজ্ঞ সভাতাসমূহ কর্মজগত থেকে দূরে সরে পড়ে। তার ব্যাপারে দরদী
দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ব্যক্তিদের মনেও এ পদ্ধতি দুর্নিঃশ্বাস চলতে পারে কিনা, এ
সম্পর্কে সন্দেহ করে। তার তথাকথিত ধারক ও বাহকগণ এবং তার নেতৃত্বের
স্বকর্পোলকশ্চিত উত্তরাধিকারীরাও বিরোধী সভাতার সঙ্গে আপেক্ষ এবং কিছুটা
দেয়া-নেয়ার মাধ্যমে দফাফারা করতে উদ্যত হয়। অথচ কর্ত্তৃত্বের প্রশ্ন দুটি
নীতিগতভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন সভাতার মধ্যে আপেক্ষ ও সমকালীন একবারেই
অসম্ভব। মানব সভাতার সংগ্রামে এ শরিকানা বরদাশ্তও করতে পারে না।
শরিকানা ও রাষ্ট্রীয় সমস্ত মনে করা তপ্তবৃদ্ধির প্রমাণ এবং একমাত্র ঈমান ও
হীমতের অভাব হেতু এ ব্যাপারে সমর্থ প্রকাশ করা যেতে পারে।
কাজেই 'হুকুমাতে ইলাহিহা' কার্যকর খোদার তরফ থেকে নবীণ যে
জীবনব্যবস্থা এনেছিলেন তাকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁদের মিশনের
চূড়ান্ত লক্ষ্য। ৪ তাঁরা জাহেলিয়াত পশ্চিমে তাঁদের এ অধিকার দিতে প্রতূল ছিলেন
যে, ইচ্ছা করলে তাঁরা নিজেদের জাহেলি আকিদ-বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত
থাকতে পারে। কিন্তু কর্তৃত্বের চারিকা তাঁদের হাতে তুলে দেবার এবং মানব
জীবনের যাবতীয় বিষাক্তিকে বলওয়াগুে জাহেলিয়াতের আইন-কানুন
অনুযায়ী পরিচালিত করার অধিকার তাঁদেরকে দিতে কোনো দিন প্রতূল হয়নি
এবং ঝঠাটতঃ দিতেও পারতো না। এজন্য প্রত্যেক নবীই রাজনৈতিক বিপ্লব
সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। অনেকের প্রচেষ্টা কেবল ক্ষেত্রের প্রতূল করা পর্যন্তই ছিল
—যেমন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। অনেকে কর্তৃত্বে বিপুলী
আন্দোলন শুরু করেছিলেন; কিন্তু হুকূমাতে ইলাহিহা কার্যকর আগেই
তাঁদের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল; যেমন ঈসা আলাইহি সালাম। আবার
অনেকে এ আন্দোলনকে সাফল্যের মঞ্জীলে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন—যেমন হযরত
ইউসুফ আলাইহি সালাম ও হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও হযরত মুহাম্মদ
মুস্তাফা সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম।

4. বর্তমান যুগে অনেক ধর্ম তীর্থ কোনো রাজার প্রায়ই বলে থাকেন যে, 'রাষ্ট্র
ক্ষমতা লাভ জীবনের উদ্দেশ্য নয়
কর্তা তা প্রণয় করার জন্যে ওয়াস করা হয়েছে।' একত্র যায় বলেন, তাদের মন-মণ্ডলে রাষ্ট্র
ক্ষমতা সম্পর্কে নিজেকে এই ধারণায় কর্তৃত্বকারী সাক্ষী হয় যে, এর খোদার প্রায়ই একটি পুনরায়। এটি যে
একটি কর্তৃত্ব এবং খেদবেদ, সে ধারণা তাদের নয়। তাঁরা আবার না যে, যীনকে বাধ্যে প্রতিষ্ঠিত
করার জন্যে যে বীরতি ক্ষমতার প্রয়োজন, তা অর্জন করা খোদার শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এ
জন্যে জিহ্বা করা ফরজ।

www.icsbook.info
নবীর কাজ

নবীগণের কার্য পর্যালোচনা করলে আমরা মোটামুটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পাইঃ

১. সাধারণ মানুষের মধ্যে চিন্তার বিপ্লব সৃষ্টি করা। নিত্যজাল ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তা পদ্ধতি ও নৈতিক বৃদ্ধি তাদের মধ্যে এমন পরিমাণে সংযোজিত করতে হবে যাতে কৃষ্ণতে তাদের চিন্তা-পদ্ধতি, জীবনের উদ্দেশ্য, মূল্য ও মর্যাদার মানদণ্ড এবং কাজের ধরন পূর্ণতর ইসলামের ছাঁড়া চালাই হয়ে যায়।

২. এ শিক্ষায় প্রভাবিত লোকদের একটি শক্তিশালী দল গঠন করে জাহেলিয়াতের হাত থেকে কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে প্রচেষ্টা চালানো। এবং এ প্রচেষ্টায় সমকালীন তমুদুনের যাবতীয় উপায়-উপকরণের আশ্রয় গ্রহণ করা।

৩. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করে তমুদুনের সমস্ত বিভাগকে নিবেদিত ইসলামের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা। এজন্য এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা, যার ফলে একদিকে ইসলামী বিপ্লবের সীমানা বিষ্মের বুকে ব্যাপকতার হতে থাকবে এবং অন্যদিকে প্রচার ও বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে ইসলামী জামায়াতে যেসব নতুন সদস্য ভর্তি হতে থাকবে, ইসলামী পদ্ধতিতে তারা মানসিক ও নৈতিক শিক্ষালাভ করতে থাকবে।

খেলাফতের রাশেদা

শেষ নবী হযরত মূহাম্মদ মুত্তফা সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেইশ বছরের মধ্যে যে সমস্ত কার্য পূর্ণরূপে সম্পাদন করেন। তাঁর পর আবু বকর সিদ্দিক (র) ও ওমর ফারুক (রা)-এর নায়ক দূজন আদর্শ নেতার নেতৃত্বাধীন সৌভাগ্য ইসলামের হয়। তাঁরা রাসূলুদ্দালাহ নয়ার এ সর্বব্যাপী কাজের সিলসিলা জারি রাখেন। অতপর হযরত উসমান (রা)-এর হাতে কর্তৃত্ব আসে এবং প্রথম প্রথম কয়েক বছর রাসূলুদ্দালাহ প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি পূর্ণরূপে জারি থাকে।

জাহেলিয়াতের আক্রমণ

কিছু একদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বত বিষ্মারের কারণে কাজ প্রতিদিন অধিকতর করিন হয়ে যাছিল এবং অন্যদিকে হযরত উসমান (রা) যার ওপর এ বিরাট কাজের বোধ রক্ষিত হয়েছিল, তিনি তাঁর মহান পূর্বসূরীদেরকে
এই খিলাফত আমলে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মধ্যে জাহেলিয়াত সমাজ ব্যবস্থা অনুপ্রেরণ করার সুযোগ লাভ করে। হযরত উসমান (রা) নিজের শিরাদান করে এ বিপদের পথরোধ করার চেষ্টা করেন; কিন্তু তা রক্ষা হয়নি। অতঃপর হযরত আলী (রা) অভিন্ন হন। তিনি ইসলামের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে জাহেলিয়াতের পাঙ্গা থেকে উদ্ধার করার জন্যে চরম প্রচেষ্টা চালান, কিন্তু তিনি জীবন দান করেন এই প্রতি বিপদের পথ রোধ করতে পারেননি। অবশেষে নবুয়াতের পদতির পরিচালিত খিলাফতের জামানা শেষ হয়ে আসে। ব্রিটানীয় রাজতন্ত্র তার স্থান দখল করে। এভাবে রাষ্ট্রের বুনিয়াদ ইসলামের পরিবর্তে আবার জাহেলিয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রকর্মী দখল করার পর জাহেলিয়াত ক্যাসার ব্যবধান ন্যায় ধীরে ধীরে সমাজদেহে তার বাহর বিদ্যমান করতে থাকে। কেনার কর্তৃত্বের চারিদিকে এখন ইসলামের পরিবর্তে তার হাতে ছিল এবং রাষ্ট্রকর্মী থেকে বক্তর হবার পর তার প্রভাবের আগতির রোধ করার ক্ষমতা ইসলামের ছিল না। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল এই যে, জাহেলিয়াত উলঙ্গ ও আবরণ মত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন বরং 'মুসলমান'-এর রূপ ধারণ করে এসেছিল। এককাল নাটিক, মুসলিম বা কাফেরের মুখোমুখি হলে তোমার মোকাবিলা করা সহজ হতো। কিন্তু সেখানে প্রথমেই ছিল তোহিদের হীরা, রিসালাতের হীরা, নামায ও রোয়া সম্পাদন এবং কুরআন ও হাদীস থেকে যুক্তি প্রমাণ ঘাণ আর তার পেছনে জাহেলিয়াত নিজের কাজ করে ছিল। একই বস্তুর মধ্যে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সমাজে একন কাঠিন জটিলতা সৃষ্টি করে যে, তার সঙ্গে মোকাবিলা করা হামেশা এককাল জাহেলিয়াতের সঙ্গে মোকাবিলা করার চাইতে বেশী কঠিন প্রমাণিত হয়েছে। উলঙ্গ জাহেলিয়াতের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে লক্ষ লক্ষ মুহাজেদিন মাত্র কাফেন বেঁধে সহযোগিতা করতে অংশ হবে।

কিন্তু এই মিশ্রিত জাহেলিয়াতের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে ওহে মুসলমানরা নয়, অনেক লীটি মুসলমানও তার সমর্থনে কোনার বেঁধে অংশ হবে এবং ওহে

5. কতিপয় মুফতি সাহেবের এ বাক্যটিকে হযরত উসমান (রা)-এর প্রতি অমর্যাদক বলে চিহ্নিত করেছেন। অথচ আমার বক্তব্য ওই একটুকু যে, হযরত উসমান (রা)-এর মধ্যে শাসন পরিচালনার একন কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অভাব ছিল, যা হযরত আলী কর্তৃক সিদ্ধিক (রা) ও হযরত উমর ফারুক (রা)-এর মধ্যে পূর্বপ্রাপ্ত ছিল। এটি ইতিহাসের আলোচনা বিষয় এবং ইতিহাসের ছাত্র এ সম্পর্কে বিচিত্র মত প্রকাশ করতে পারেন। এটি ফিকাহ ও কালমের বিষয়বস্তু নয়। কাজেই দুর্ধর্ষতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্ধর্ষতা আকারে এ সম্পর্কে কোনো রয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে না।
ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন

তাই নয়, বরং ঐ জাহেলিয়াতের সংগে যুদ্ধকালীকে উল্টো দোমারোপ করা হবে। জাহেলী নেতৃত্বের সিঙাসনে এবং জাহেলী রাজনীতির মসন্দে 'মুসলমানের' সমাসিন হওয়া, জাহেলী শিক্ষাতন্ত্রে 'মুসলমানের' শিক্ষকতা করা এবং জাহেলিয়াতের আসনে 'মুসলমানের' মূর্শ্দ হিসেবে উপার্শন করা এক বিষাদ প্রতারণা বে কিছুই নয় এবং খুব কম লোক এই প্রতারণা থেকে বংচিত হবে।

এ প্রতি বিপরের সবচাইতে ভয়াবহ দিক এই যে, ইসলামের আবরণে তিন ধরনের জাহেলিয়াতই তাদের শিক্ষা গোড়াতে শুরু করে এবং তাদের প্রভাব প্রতিদিন অধিকতর বিস্তৃত লাভ করতে থাকে।

নির্ভর্জাল জাহেলিয়াত রাষ্ট্র ও সম্পদ করায়ত করে। নামে খিলাফাত কিন্তু আসলে ছিল সেই রাজত্ব যাকে খতম করার জন্যে ইসলামের আগমন হয়েছিল। বাদশাহকে 'ইলাহ' বলার হিমাট কারার ছিল না, তাই 'আ-সুলতানু মিস্লিলাহ'-এর তালাশ করা হয়। এ বাহানায় 'ইলাহ' যে আনুগত্য লাভের অধিকারী হন বাদশাহরাও তার অধিকার লাভ করে। এ রাজত্বের ছয়বাইয়া আমির-ওমরাহ, শাসকবর্গ, গভর্নরবৃদ্ধ, সনাবাহিনি ও সমাজের কর্তৃপক্ষশালী লোকদের জীবনে কম-বেশী নির্ভর্জাল জাহেলিয়াতের দৃঢ়ত্বক্ষী বিষাদ লাভ করে। এ দৃঢ়ত্বক্ষী তাদের নৈতিক বৃত্তি ও সামাজিকভাবে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দেয়। অতঃপর সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই এই সংগে জাহেলিয়াতের দর্শন, সাহিত্য এবং শিল্প বিষাদ লাভ করতে থাকে এবং বিভিন্ন বিদ্যা ও শাস্ত্র এ পদ্ধতিতে সংকলিত ও রচিত হতে থাকে। কেননা এসব জিনিস অর্থ ও রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল। আর যেখানে অর্থ ও রাষ্ট্র জাহেলিয়াতের আয়তাধীন সেখানে তাদের ওপর জাহেলিয়াতের কর্তৃত্ব অনিবার্য। কাজেই এ কারণেই গ্রীক অনাবর্ত দর্শন, বিদ্যা ও সাহিত্য ইসলামের সংগে সম্পূর্ণ বলে কথিত সমাজের মধ্যে অনুপ্রেষণ করার পথ খুজে পায়।

6. হাদীসে এ শাশ্ত্রের উল্লেখ আছে, ছত্তে সন্ধে নেই, কিন্তু এর সম্পূর্ণ ভূমি অর্থ হঠে করা হয়েছে। আরবী ভাষায় সুলতানের অসাধারণ অর্থ হলো কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের জন্যে এ শাশ্ত্র নিষ্ক্রিয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। নবী (স) এ শাশ্ত্রটিকে কৃষ্ণম অর্থে নয় বরং তাতে আলী অর্থে ব্যবহৃত করেছেন। নবী কর্মী (স)-এর ইরাদের অর্থ হলো এই যে, রাষ্ট্র ও কর্তৃপক্ষ আসলে আল্লাহ তাযারার কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠায় থাকে। এ বিষয়ের প্রতি এটি প্রতিষ্ঠিত পেয়েছে, এ যে যদি তাঁর সমাজ বহাল রাখতে অর্থ হক ও ইসলামের অনুযায়ী রাষ্ট্র চালায়, তাহলে আল্লাহ তাযারা সমাজ দান করবেন। আর তুমি বয়কি খোদার এ হাজার অপরাধ করবে অর্থাৎ যুদ্ধ ও বার্তাবাদিত্বকর রাষ্ট্র পরিচালনা করতে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন। নবী কর্মী (স)-এর এ আনুকূল্য বাণীকে কেবল করে লোকেরা বাদশাহকে খোদার প্রতিষ্ঠায় গণ্য করেছে এবং নবী কর্মী (স)-এর উদেশ্যের প্রতিকূলে এটিকে বাদশাহ পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে পরিণত করেছে।

www.icsbook.info
সাহিত্যের প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে ‘কালাম’ শাখার বিতর্ক শুরু হয়, মোতাজিলামতবাদের উদ্দেশ্য হয়, নাস্তিকতা ও ধর্ম বিরোধিতা শাখা-প্রশাখা বিদ্যমান করতে থাকে এবং ‘আকীদার’ সুপ্রাচীনতম মারপীঠ নতুন নতুন ‘ফেরকা’—সম্প্রদায়ের জন্য দেয়। এখানেই শেষ নয় বরং যে সমস্ত জাতিকে ইসলাম নৃত্য, গীতি ও চিত্তাংকনের ন্যায় নির্ভরগীল জাহেলি শিশু-সংক্রান্তির হাত থেকে উদ্ধার করেছিল তাদের মধ্যে এগুলো আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

শেরক মিশ্রিত জাহেলিয়াত জনগণের ওপর হামলা করে তাদেরকে তৌহিদের পথ থেকে সরিয়ে গোমরাহির অসংখ্য পথে বিক্ষুব্ধ করে দেয়। একমাত্র সুপ্রাচীন মূর্তিপূজা অনুষ্ঠান সম্প্রদায় হয়নি, নয়তো এমন কোনো ধরনের শেরক ছিল না, যা ‘মুসলমানদের’ মধ্যে প্রচলিত হয়নি। পুরাতন জাহেলি মতবাদে বিশ্বাসী জাতিসমূহের যে সমস্ত লোক ইসলামের আওতায় প্রবেশ করে, তারা অনেক শেরকের ধর্মায় ও মতবাদ নিজেদের সংগে করে নিয়ে আসে। এখানে তাদেরকে শুধু একটুকু কষ্ট করতে হয় যে, পুরাতন মারুজরের স্থলে তাদেরকে মুসলিম মনীষীদের মধ্যে থেকে কতিপয় নতুন মারুজাল তালাশ করতে হয়, পুরাতন মস্ত-মসজিদের স্থলে আউলিয়া–দরবেশগণের সমাধির ওপর স্বীকৃত থাকতে হয় এবং ইবাদতের পুরাতন আচার–আনুষ্ঠানের স্থলে নতুন আচার–অনুষ্ঠান উদ্ভাবন করতে হয়।

এ কাজে দুরন্ত আলেম সমাজ তাদেরকে বিপুলভাবে সাহায্য করে এবং শেরক ইসলামের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার পথে মস্ত প্রতিষ্ঠাতার সৃষ্টি হতে তা দূর করে দেয়। তারা অন্যতম দুঃসাহসিকতার সংগে কুরআনের আযাত-এবং-হাজীসের বাণী বিকৃত করে ইসলামে আউলিয়া পূজা ও কবর পূজার জন্যে স্থান সংকুচিত করে। শেরকের কাজ করার জন্যে ইসলামের পরিবাহ্য থেকে শহ সংগ্রহ করে এ নতুন শরীয়তের জন্যে আচার–আনুষ্ঠানের এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে যে, তা সুপ্রাচীন ও বড় শেরকের আওতায় পড়ে না। এ সৃষ্টি শিশুসুলত সাহায্য ছাড়া ইসলামের মধ্যে অনুষ্ঠান করার পথ অবিচার করা শেরকের পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হতে না।

বৈরুগ্ন্যবাদী জাহেলিয়াত ওলামা, মাশারেখ, সুফী ও পরেজগার লোকদের ওপর হামলা করে এবং তাদের মধ্যে সেসব ক্রটি বিদ্যমান করতে থাকে, যেগুলোর দিকে আমি ইতিপূর্বে ইশারা করেছি। এ জাহেলিয়াতের প্রভাবে মুসলিম সমাজে পেটোয়ার্ডী দর্শন, বৈরুগ্ন্যবাদী চারিরিক আদর্শ এবং

7. মাওলানা শিকনী নোয়ানী ও জাহহিস আবির আলীর মতো লোকেরা ঐব বাদাহার এখন কার্যার্থক ইসলামী তাহাজীব ও মাদুরের খেদমত বলে পণ্য করেছেন।
মুজাহিদদের প্রয়োজন

এ তিন ধরনের জাহেলিয়াতের ভীড় থেকে ইসলামকে উদ্ধার করে পুনরায় তাকে সবল ও সতর্ক করার জন্যে মুজাহিদদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এ থেকে দেখা যায় যে, জাহেলিয়াতের এ সায়লাবে ইসলাম একোসাইডে ভোগে গিয়েছিল এবং জাহেলিয়াতের পূর্বাভাস বিজয়ি লাভ করেছিল। 

সত্যি বলতে কি, সেই জাতি ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল অথবা পরে প্রভাবিত হয়, তাদের জীবনে ইসলামের সংক্রামক প্রভাব কম-বেশি চিরকাল বর্তমান থাকে। ইসলামের প্রভাবেই বড়ো বড়ো সৈনিক ও সারমারীয় বাদশাহীরা এখনো এখনো ভয়ে কেঁপে উঠতো এবং সততা ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতো। 

ইসলামের গুণেই রাজাবংশের অন্ধকারময় ইতিহাসের বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা নেকি ও নৈতিক সততার প্রজ্ঞাল শিখা প্রত্যক্ষ করি।

যেসব শাহী খানাদের নিজেদেরকে খোদার ন্যায় পরাক্রমশালী মনে করতো তাদের মধ্যে একমাত্র ইসলামেরই কারণে অনেক দীনদার, খোদাতীর এবং নায়োর ব্যক্তিত্বের উদ্ধব হয়। বাঁই রাজাবংশকের অধিকারী হওয়ার সত্ত্বেও যথাসাধ্য দায়িত্ব সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। এমনিভাবে শাহী দরবারে, দর্শন ও বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ে ও শিল্পের কর্মস্থলে, চিকিৎসা ও সংসার বিরাগীর খানকায় এবং জীবনের অন্যান্য বিভাগেও ইসলাম অনরক কমরেশী নিজের পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে।

জনগণের মধ্যে শেখর মিশ্রিত জাহেলিয়াতের অনুপ্রেরণ সত্তেও ইসলাম হামেশা আকাদা-বিশ্বাস, নৈতিক-চরিত্র ও সামাজিকতার মধ্যে সংক্রামক ও প্রতিরোধমূলক উভয় দিক দিয়ে নিজের অনুপ্রেরণ জারি রাখে, যার ফলে মুসলিম জাতির চরিত্রের মান মোটামুটি অমুসলিম জাতিসমূহের থেকে হামেশা উন্নত থাকে। এছাড়াও এথি এমন লোকের পরিসংখ্যান ছিল, যারা দুর্ভোগ সাথে ইসলামী নীতি অনুসরণ করে এবং ইসলামী জান ও কর্মকে নিজের জীবনে এবং নিজের সীমিত পরিবেশে জীবিত রাখার চেষ্টা করে।

কিন্তু নবী তার দেরীগণের নে আসল উদ্ভাবন ছিল—তার জন্য এ দুটো জিনিস অকিছিক ছিল। জাহেলিয়াতের হাতেই কর্নীভূত থাকে এবং ইসলামের নির্মাণে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তি হিসেবে কাজ
কর্মে, এ যেমন যথেষ্ট ছিল না তেমনি এ যথেষ্ট ছিল না যে, এখানে ওখানে
দু' চারটি লোকের সীমিত জীবন ক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর বৃহত্তর
সমাজে জীবনে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মিশ্রিত উপাদান প্রসার লাভ করতে
থাকবে। কাজেই প্রতি যুগে দীন এমন শক্তিশালী ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানের
মূখ্যতম ছিল এবং আজ আছে, যারা বিপথে পরিচালিত জীবনধারা পরিবর্তন
করে তাকে পুনর্বার ইসলামের পথে আগ্রহ করতে সক্ষম।

‘মাই ইউজাফ্তিদলাহা দীনাহা’ হাদিসটির ব্যাখ্যা

নবী করিম (س) তার একটি হাদিসে এরই খবর দিয়েছেন। হাদিসটি আবু
দাউদে হযরত আবু হুরাইয়া (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি হলো হয়
‘আল্লাহ আমাদের দান করান যে তার জন্য এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যিনি তার জন্য
তার দীনকে সবল ও সতেজ করবেন।’

কিন্তু এ হাদিস থেকে অনেক লোক ‘তাজদীদ’ ও ‘মুজাম্মেদীন’ সম্পর্কে
সম্পূর্ণ ভুল ধরণ গ্রহণ করেছেন। তারা ‘আলা রাসি কুলি মেযাতিন’৷র্তিক
শতকের শিরোভাগে—থেকে এ অর্থ নিয়েছেন যে, প্রতি শতকের শুরুতে বা
শেষভাগে আর ‘মাই ইউজাফ্তিদলাহা দীনাহা’—যিনি তার জন্য তার দীনকে
সবল ও সতেজ করবেন—থেকে এ অর্থ নিয়েছেন যে, এ কাজ নিষ্ঠায় এক
ব্যক্তি করবে। তাই তারা ইসলামের অগ্রে ইতিহাসে প্রতি শতকের শুরুতে
বা শেষভাগে জন্মদান করেছেন বা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং দীনের সংস্কারের
কাজও করেছেন, এমন লোকদের অনুসংধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। অথচ ‘রাস’ এর
অর্থ শুধু বা শেষ ভাগ নয়। প্রত্যেক শতকের শিরোভাগে কোনো ব্যক্তি বা
দলকে ঘ্রেণ করার পরিস্থার অর্থ হলো এই যে, তারা সমকালীন জান, বিজ্ঞান,
চিত্তা ও কর্মের গতিপথর ওপর সুপ্রস্তু এভাবে বিস্তার করবেন। আর ‘মান’
শব্দটি আরবী ভাষায় একচেন ও বহুজুনে উভয়ের জন্যে ব্যবহৃত হয়। তাই
‘মান’ অর্থ এক ব্যক্তিত্ব হতে পারে এবং বহু ব্যক্তিত্ব হতে পারে; আবার সম্প্রা
প্রতিষ্ঠানও হতে পারে। নবী করিম (س) মে খবর দিয়েছেন তার সুপ্রস্তু অর্থ
হলো এই যে, ইনশাআল্লাহ ইসলামী ইতিহাসের কোনো এক শতাব্দী এমন
লোকদের থেকে বঞ্চিত থাকে না, যারা জাহেলিয়াতের তুফানের মোকাবিলা
করবেন এবং ইসলামকে তার আসল প্রশংসক ও আকৃতিতে পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত
করার জন্যে প্রচেষ্টা চালাবেন। এক শতাব্দীতে যে শুধু একজন মুজাম্মেদ হবে
এমন কোনো বাধ্যভাবকতা নেই। এক শতাব্দীতে একাধিক ব্যক্তি ও দল এ
কার্য সম্পাদন করতে পারেন। সম্মত মুসলিম জাহানের জন্যে যে শুধু একজন মুজাদ্দিদ হবেন এরও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। একই সময়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যক্তি দীনের তাজ্জীদের জন্যে প্রচেষ্টা চালাতে পারেন। এ প্রসংগে যে ব্যক্তি কোনো কার্য সম্পাদন করবেন, তাকেই যে, 'মুজাদ্দিদ' উপাধি দান করা হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এ উপাধি একমাত্র তাদেরকেই দান করা যেতে পারে, যারা দীনের তাজ্জীদের জন্যে কোনো বিরাট ও বিশিষ্ট কার্য সম্পাদন করেন।
মুসলিম জাতির কতিপয় বড় বড় মুজাদ্দিদ ও তাঁদের কার্যাবলী

ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ক্ষুদ্র করে আমি ভবিষ্যতের প্রধান মুজাদ্দিদের
উল্লেখ পূর্বেই করলাম। এর কারণ হলো এই যে, মানুষ কামেল মুজাদ্দিদের
মর্যাদা ও স্থান সম্পর্কে আগেই ওয়াকিফহাল হয়ে যাবে। এতে করে তাদের
জন্যে প্রতাপিত পূর্বতার মোকাবিলায় আঘাতিক সংক্রামক কার্যাবলীর মর্যাদা
ও স্থান উপলব্ধি করা সহজ হবে। এ পর্যন্ত যতগুলো সংক্রামক কার্যাবলী
সম্পাদিত হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এবার আমি তুলে ধরবো।

উমর ইবনে আবদুল আসিয়ম

ইসলামের প্রথম মুজাদ্দিদ হলেন হযরত উমর ইবনে আবদুল আসিয়ম
(র)। ৮ রাজ পরিবারে তাঁর জন্ম। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে দেখেন, পিতা মিসরের ন্যায়
বিরাট দেশের গভর্নর। আরো বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে নিজেও উমাইয়া সরকারের অধীনে
গভর্নর পদে নিযুক্ত হন। বনু উমাইয়া বংশীয় বাদশাহতে যে সমস্ত জায়গারের
সাহায্যে নিজেদের খাদ্যন্তে বিপুল ধনশালী করেন, তাতে তাঁর এবং তাঁর
পরিবারের পরিজনেরও বিরাট অংশ ছিল। এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির আয়
ছিল বার্ষিক ৫০ হাজার আররফি। বিতর্কলীলার ন্যায় শায়খ-শওকতের সংগে
জীবন-যাপন করতেন। পোশাক-পরিচ্ছদ, খানা-পিনা, বাড়ি-ঘর, যানবাহন,
বহাব-চরিত্র সবই ছিল শাহজাদার ন্যায়। এ পরিস্থিতিতে পরবর্তীকালে তিনি
কর্ম সম্পাদন করেন, তার সংগে তাঁর পরিবেশের কোনো দুরত্ব সম্পর্কে
ছিল না। কিন্তু তাঁর মাতা ছিলেন হযরত উমর (রা)-এর পৌত্রী। নবি করিম
(স) এর ওফোরের ৫০ বছর পর তাঁর জন্ম হয়। তাঁর যুগে অগণিত সাহায্য ও
তাবেঈন জীবিত ছিলেন। শুরুতে তিনি হাদীস ও ফিকাহের পূর্ণ শিক্ষা লাভ
করেছিলেন। এমনকি তিনি প্রথম শ্রেণীর মুজাদ্দিদদের মধ্যে গণ্য হতেন এবং
ফিকাহ শাখে ইজতিহাদের মোগাতা রাখতেন। কাজেই নবি করিম (স) ও
খোলাফায়ে রাশিদীনের আমলে তমুদুনের বুনিয়াদ কিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল
এবং খোলাফা রাজতন্ত্র পরিবর্তিত হবার পর এ বুনিয়াদসমূহে কোনো ধরনের
পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তত্ত্বাবধানে ঐকান্তিক ও উপলব্ধি করা তাঁর
পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। অবশ্য কার্যতঃ যে জিনিসটি তাঁর পথের
প্রতিবন্ধক হতে পারতো, তাহলে এই যে, তাঁর নিজস্বই খাদ্য ছিল এ

৮. তিনি ৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ১০১ হিজরীতে ইতেমাদ করেন।
জাহেলী বিপ্লবের দ্বটা। এ বিপ্লব থেকে পূর্বতঃ ও বিপুলতায় লাভবান হচ্ছিল তাঁর পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-বন্ধন, তিনি নিজে এবং তাঁর সত্ত্বা-সত্ত্বার।

tাঁর বংশধর স্বাধীনতা অধিকতর লাভদান এবং ভবিষ্যত বংশধরদের পারিবারিক মন্ত্রের জন্য তাকেও নিজের রাজতন্ত্রে ফেরাওনের ন্যায় ঝোঁকে বসা উচিত ছিল।

নিজের বিদ্যা-বৃদ্ধি, জ্ঞান ও বিবেককে নির্দোষ বঙ্গদেশ লাভের মোকাবিলায় কর্মকাণ্ড করে দিয়ে হক, ইনসাফ, নৈতিকতা ও নৈতিকবাদিতার গোলক ধারায় পদার্পণ না করাই তাঁর জন্যে বেহতের ছিল। কিন্তু ৩৭ বছর বয়সে নেহাত ঘটনাক্রমে যখন তিনি রাজতন্ত্রের অধিকারী হন এবং অনুভূত করতে পারেন যে, কি বিপুল বিরাট দায়িত্ব তাঁর কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তখন আচার্য তাঁর জীবনের ধার্য্য পালনে যায়। বিশ্বপ্রাচ্য জীবন্তত্ত্ব না করেই তিনি জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় নিজের জন্যে ইসলামের পথ বেছে নেন। যেন এটি তাঁর পূর্বসূরীকৃত সিদ্ধান্ত ছিল।

বংশানুক্রমিক পদ্ধতিতে তিনি রাজতন্ত্রের মলির হন। কিন্তু বাইয়াত (আনুমাতিক দলিল) গ্রহণ করার সময় জনসাধারণে তিনি পরিকাঠামো বলে দেন: “আমি তোমাদেরকে নিজের বাইয়াত থেকে আজাদ করে দিচ্ছি, তোমরা নিজেদের ইচ্ছামতো কাজে খলিফা নির্বাচন করতে পারো।” অতপর জনসাধারণ যখন সর্বনাশনভাবে এবং সাহসে বললে যে, আমরা আপনাকেই নির্বাচন করছি, তখনই তিনি স্বতঃসিদ্ধ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অতপর রাজকীয় জাক-জমক, ফরুওনের শাসন পদ্ধতি, কাইসার ও বিসরার দরবারী নিয়ম-নীতি সবই বিদায় করে দেন এবং প্রথম দিনেই রাজযোগ্য সরবরাহ করে মুসলমানদের মধ্যে তাদের খলিফার যোগ্য পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

অতপর রাজবংশের লোকেরা যেসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, সেদিকে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তাদেরকে সর্বদিক দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের সম্প্রদায়ে নামিয়ে আনেন। তাঁর নিজের জায়গার সহ অন্যান্য যেসব জায়গার রাজবংশের দখলে ছিল সবগুলিই বায়তুলমালে ফিরিয়ে দেন। এ পরিবর্তনের ফলে তাঁর নিজের যে ক্ষতি হয় সে সম্পর্কে এতদূরুক বলাই যথেষ্ট যে, তাঁর বার্তাকে যাতে বায়তুলমালের অর্থক তিনি নিজের এবং নিজের খানাদের জন্যে হারাম করে দেন। এমনকি খলিফা হিসেবে সেনানো গ্রহণ করেননি। নিজের জীবনের সমগ্র রূপাংটি বদলিয়ে দেন। খলিফা হবার আগে রাজওঁতি শান-শওকতের সংগে

www.icsbook.info
জীবন-যাপন আর খলিফা হবার সংগে সংগেই ফকির জীবন অবলম্বন,৯ অবশ্যই বিষয়ের ব্যাপার।

ফগুহ ও পরিজনদের সংশ্রবনের পর তিনি রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে নজর দেন। অত্যাচারী গভর্নরদেরকে বরখাস্ত করেন এবং গভর্নরদের দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্যে সৎলোকদের অনুসন্ধান করে বের করেন। সরকারের প্রশাসনিক কর্মচারিবর্গের নিয়ম-কানুন মুক্ত হয়ে প্রজাদের জান, মাল, ইঙ্গিত-আবকর ওপর অন্যদিকে হত্যক্ষপ করার অধিকার হয়ে বসেছিল। তিনি তাদেরকে পুনর্বার আইন-শৃঙ্খলার অনুগত করেন এবং আইনের রাজত্ব কায়েম করেন। কর নির্ধারণের সময় নীতি-নিয়মই পরিবর্তিত করেন। এবং আবগুরীসহ বনি উমাইয়া বাদশাহগণ যে সমস্ত অর্থ ও অন্যান্য কর বসিয়েছিলেন, সেগুলোকে সংগে সংগেই বাতিল করে দেন। যাকাত আদায়ের জন্যে যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তা নতুনভাবে সংশ্লেষান করেন এবং বায়তুলমালের অর্থকে পুনর্বার সাধারণ মুসলমানদের কল্যাণের জন্যে ওয়াকফ করে দেন। অমুসলিম প্রজাদের সাথে যেসব অন্যান্য আচরণ করা হয়েছিল, সংগে সংগেই তার প্রতিকার করেন। তাদের যেসব উপাসনালয় অন্যান্যভাবে দখল করা হয়েছিল, সেগুলো তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। তাদের যেসব জমি হিসেবে নেয়া হয়েছিল, তা তাদেরকে ফেরত দেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের প্রাপ্ত যাবতীয় অধিকার পুনর্বার তাদেরকে প্রদান করেন। বিচার বিভাগকে সরকারের শাসন বিভাগের অধীনতা মুক্ত করেন। এবং মানুষের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা-করার নিয়ম ও সম্পর্কেই সরকারী ব্যবস্থার প্রভাবমুক্ত করে ইসলামী নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এভাবে হযরত উমর ইবনে আবুদল আরীয়ের হাতে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন লাভ করে।

অতঃপর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সাহায্যে তিনি অর্থ শতাব্দীকালের জাহালী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কারণে সমাজ জীবনের চতুর্দিকে বিস্তার লাভকারী জাহালিয়াদের নিদর্শনসমূহকে জনগণের মানসিক, নৈতিক ও সমাজ জীবন থেকে নির্মূল করতে উদ্যোগ হন। বিকৃত আকিদা-বিশ্বাসের প্রচার ও সৌরাঙ্গ বন্ধ করে দেন। ব্যাপকভাবে জনশ্রমার ব্যবস্থা করেন। কুরআন, হাদিস ও ফিকহের শিক্ষার দিকে বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর দৃষ্টি পুনর্বার আকৃষ্ট করেন এবং এমন একটি তত্ত্বাবধান আন্দেলন গড়ে তুলন যার প্রভাবে ইসলামে আবু হানিফা (র), মালিক (র), শাফীয়া (র) ও আহমদ ইবনে হামুল (র)-এর নয় মজুতাহিদগণের আবির্ভাব

9. জীবনীকারকরা বলেন যে, খলিফা হবার আগে জাহাজ নিরর্থ মূল্যের পোশাক উমর ইবনে আবদুল আরীয়ের হাত হতে না। কিন্তু খলিফা হবার পর চার-পাঁচ নিরর্থ মূল্যের পোশাকে বিক্রী হয়নি জন্যে বড়ই মূল্যবান মনে করতেন।
হয়। শরীয়তের আনুগত্য করার শেষে মানুষের মধ্যে নতুন করে সজ্জিত করেন। রাজত্বের বদলে সৃষ্টি ষ্ঠর পান, চিত্রাঙ্কন ও বিলাসান্ত ব্যাধি নির্মূল করেন। এবং যেসব উদেশ্যে পূর্ণ করার জন্য ইসলাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, মোটামুটি তিনি সেগুলো পূর্ণ করেন অর্থাৎ

*الذين أن مكَّنَّهم في الأرض قاموا الصَّلَاة واتَّقُوا الزَّكَاة واتَّمُّوا* 

*بالْمَعْرُوف وِيْتَهَوَّنُ عَنَّلِيْلِكَ.*

অতি অল্প সময়ের মধ্যে জনজীবন এবং আত্মজীবন পরিস্থিতির ওপর এ সরকারি পরিবর্তনের প্রভাব পড়তে শুরু করে। জনৈক বর্ণনাকারী বলেন, এমনি যেমন লিখের তাদের আলাপ-আলোচনায় বৈধকে অটলিকা ও উদযান সম্পর্কে আলোচনা করতো। সেলায়মান ইবনে আব্দুল মালিকের জামানায় ইন্দ্রিয় লিপ্তার দিকে জনগণ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ওমর ইবনে আব্দুল আত্মীয় খলিফা হবার পর এমন অবস্থায় সৃষ্টি হয় যে, কোথাও চারজন লোক একত্রিত হলেই সেখানে নামায, রোগা ও কুরাস সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়ে যেতো। অমুসলিম রাজ্যের ওপর এ সরকারি এতবেশী প্রভাব পড়ে যে, এ অল্প সময়ের মধ্যে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে এবং জিজিয়ার আয় আচানক একটা ক্রাস প্রাপ্ত হয় যে, তার ফলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারো প্রভাবী হয়ে পড়ে। ইসলামী রাষ্ট্রের চারপাশে যেসব অমুসলিম রাষ্ট্র হয়ন উমর ইবনে আব্দুল আত্মীয় তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তাদের মধ্যে থেকে একাধিক রাষ্ট্র ইসলাম গ্রহণ করে। 

তৎকালে ইসলামী রাষ্ট্রের সবচাইতে বড় প্রতিরক্ষা ছিল রোম সম্রাজ্য। প্রায় এক শতাব্দীর কাছে সেগুলো চুক্তি ছিল। হয়তো উমর ইবনে আব্দুল আত্মীয়ের সময়েও তাদের সংগে রাজনৈতিক সংঘর্ষ জারি ছিল। কিন্তু রোম সম্রাজ্যের ওপর তাঁর বিরাট নেতিক প্রভাব পড়েছিল। তাঁর মৃত্যুর কবর থেকে রোম সম্রাট যে মন্তব্য করেন, তা থেকেই তা আন্দাজ করা যায়:

“কোনো সংসার বৈবাহী যদি সংসার ত্যাগ করে নিজের দরজা বন্ধ করে নেয় এবং ইবাদে মশগুল হয়ে যায়, তাহলে মেঘে মোটেই অবাক হই না। কিন্তু আমি অবাক হই সেই ব্যক্তির ব্যাপারে, যার পদতলে ছিল দুনিয়ার বিপুল সম্পদ-সম্পত্তি আর সে তা হেলায় ঢেলে ফেলে দিয়ে ফকিরের নয় জীবন-যাপন করে।”

িসলামের প্রথম মুজাদিদ কেবলমাত্র আড়াই বছর কাজ করার সুযোগ পান। এ সংক্ষেপে সময়ে বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করেন। কিন্তু বনি উমাইয়ার

www.icsbook.info
প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁর শক্তি হয়ে দাড়ায়। ইসলামের জীবনের মধ্যে তাদের মৃত্যু নিহিত ছিল। কাজেই এ সংকারমূলক কাজকে তারা কেমন করে বরদাশ্ত করতে পারতো? অবশেষে তারা যত্নশীল করে তাঁকে বিশ্বাস করালেন এবং মাত্র ৩৯ বছর বয়সে দীন ও মিরাতের এ নিঃসৃত্য খাদিম দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। তিনি যে সংকারমূলক কাজের সূচনা করেছিলেন, তা প্রায় পূর্বতার কাছাকাছি পৌছে দিয়েছিল। আর শুধুমাত্র বংশানুক্রমিক মনোনয়নের পদ্ধতি খতম করে তদমুখে নিঃসৃত্য ভিজিক বিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজটিকে বাকী ছিল।

এ সংকার পরিকল্পনাটি তাঁর সমুখে ছিল। তিনি নিজের এ পরিকল্পনাটি প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু সমাজ জীবন থেকে উমাইয়া শাসনের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা এবং সাধারণ মুসলমানদের নৈতিক ও মানসিক অবস্থাকে বিলাফতের বেঁধা বহন করার জন্যে তৈরী করা নিতান্ত সহজ ছিল না। মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে তা সমাপ্ত হতে পারতো না।

চার ইমাম

দ্বিতীয় উমরের (র) ইতিহাসের পর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের চাকুরিকর্তা পুনরায় ইসলাম থেকে জাহালিয়াতের দিকে স্থানান্তরিত হয় এবং তিনি যে কার্য সম্পাদন করেছিলেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ বিধান হয়ে যায়। কিন্তু তবুও ইসলামী মানবে তিনি যে জগতের সৃষ্টি করেছিলেন এবং যে তত্ত্ব আদ্দোলনের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন, তার অগ্রন্থি বোধ করার শক্তি করের ছিল না। বনি উমাইয়া ও বনি আব্বাসীয়দের বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এ আদ্দোলনের পথরোধ করে দাড়ায়। কিন্তু তাদের সব জরিজিও নিষ্ক্রিয় হয়। এ আদ্দোলনের প্রভাবে কুরআন ও হাদিস শাসন, গবেষণা, ইতিহাস ও নীতি-নির্দেশ সংরক্ষণ ও প্রণয়নের বিরুদ্ধে কার্য সম্পাদিত হয়। দীনের মূলনীতি থেকে বিস্তারিত ইসলামী আইন প্রণয়ন করা হয় এবং একটি ব্যাপক তথ্যবিশ্বাস ব্যবস্থাকে ইসলামী প্রস্তাবিত করার জন্যে যত প্রকার নিয়মাবলী ও কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন, খুব বিস্ময়সহ তার প্রায় সমস্তই প্রণয়ন করা হয়।

দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে প্রায় চতুর্থ শতক পর্যন্ত এ কাজ পূর্ণ শক্তিতে চলতে থাকে।

এ যুগের মুজাদ্দিদগণের মধ্যে চারজন ইমামের নামেই ১০ উল্লেখযোগ্য।

ফিকহর চারটি মহাবৃত্ত তাঁদের চারজনের সংগে সম্পর্কিত। তাঁরা ছাড়াও আর এই তালিকায় উল্লেখযোগ্য।

১০. ইমাম আবু হানিফা (র) ৮০ হিজরীতে (৬৯৯ খ্রীস্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ইতেমাদে করেন ১৫০ হিজরীতে (৬৫৭ খ্রীস্টাব্দ)। ইমাম মালিক র জন্মগ্রহণ করেন ৯৫ হিজরীতে (৭৪৪ খ্রীস্টাব্দ) এবং ইতেমাদে করেন ১৭৯ হিজরীতে (৭২৮ খ্রীস্টাব্দ)। ইমাম শাফেীর (র) জন্মগ্রহণ করেন ১৫০ হিজরীতে (৭৫৪ খ্রীস্টাব্দ)। ইমাম আলী ইবনে হাজার (র) জন্মগ্রহণ করেন ১৬৪ হিজরীতে (৭৮০ খ্রীস্টাব্দ) এবং ইতেমাদে করেন ২১৪ হিজরীতে (৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ)।

www.icsbook.info
বহু সংখ্যক মুজতাহিদ ছিলেন। কিন্তু যে কারণে তাদের মরতবা মুজতাহিদের পর্যায় থেকে মূজাদ্দিদের পর্যায়ে উন্নীত হয় তাহলো এই। প্রথমত, তারা নিজেদের গুরুদের দৃষ্টিকোণ ও অফিসাবিক বৃদ্ধি বৃদ্ধির সাহায্যে এমন চিন্তাধারায় জন্ম দেন, যার বিপুল শক্তি সম্ভার সাত-আট শতাধিক পর্যন্ত মুজতাহিদ পয়ড়া করতে থাকে। তারা দীনের মূলনীতিসমূহ থেকে বিদ্যালিত শিক্ষিত উদ্বোধন করার এবং জীবনের বাস্তব বিষয়বলি শরীরের নীতিসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার এমন সার্বজনীন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন যার ফলে পরবর্তীকালে তাদের ঐ পদ্ধতির ভিত্তিতেই যাবতীয় ইজতিহাদমূলক কার্যাদি সম্পাদন সম্ভব হয়েছে এবং ভিয়েনা তেও এ সম্পর্কিত কোনো কার্য তাদের সহোধিতা ছাড়া সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয়ত, রাজ সরকারের সাহায্য ব্যতিরেকে তার সবরকম অনুরোধে মুক্ত হয়ে বর্ণ তার অনুরোধের তীব্র মোকাবিলা করায় তারা এসব কার্য সম্পাদন করেন। এক্ষেত্রে তারা এমন এমন কষ্ট ভোগ করেন যার কল্পনা করতেও শরীর শহিন্তায় ওঠে। ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন 'উমাইয়া' ও বলেন 'আবাস উভয়ের আমলেই বেদবেদ ও কারাদও ভোগ করেন। এমন কি অবশেষে তাকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করা হয়। ইমাম মালিকের (র) ইব্বাসীয় বাদশাহ মনসুরের আমলে ৭০ বেদবেদ দেয়া হয় এবং বীরভূতে তাকে পিছনে পড়ে করে বাঁধা হয়ে যায়, তার হাতন্ত্র শরীর থেকে বিচিত্র হয়ে যায়। ইমাম আহমদ ইবনে হায়তের ওপর মামুন, মোতাসিম ও ওয়াসিক তিনজনের আমলেই অনবরত নির্যাতন চালানো হয়। তাকে এতক্ষণ মারাত্মক করার হয় যে, সমবতৃ উট এবং হাতেও সে মারের পর জীবিত থাকতে পারতো না। অতপর মুতাওয়াকিলের আমলে তার ওপর এত বেশী রাজকীয় পুরস্কার, সম্ভাবনা ও উল্লেখ-শ্রেষ্ঠ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় যে, তিনি ঘাবড়িয়ে চিতকার করে ওঠেন।

'এই আরম্ভিক এবং কারাদের চাইতেও এগুলো আমার ওপর অধিকতর কঠিন বিপদ।' কিন্তু এসব সতর্কে এ মনীষীণ ধীরী ইলম সংকলন ও প্রশ্নের ব্যাপারে গুু রাজ প্রভাব ও অনুরোধের পথের ওপরে করেন বর্ণ এমন পদ্ধতির প্রচার করেন যার ফলে পরবর্তীকালে সমস্ত ইজতিহাদমূলক ও মৌলিক রচনার কাজ পূর্ণরূপে রাজ দরবারের প্রভাব মুক্ত থাকে। এরই ফল, স্বদেশ আজ ইব্লিস আইন এবং কুরআন ও হাদিস শাস্ত্রের যত্নের নির্দেশ ও নির্দেশনা বই আমরা পাচ্ছি, তাতে 'জাহেলিয়াদের' সামান্য গভীর পর্যন্তেও নেই। এ জিনিসগুলো এমন পরিষ্কার ও পরিকল্পনা অবয়বে বিভাগু কমিকসকে স্থানান্তরিত হয়ে যে, বাদশাহ ও আমীর-ওমরাহদের কয়েক শতাধিক দিন্ত্রী লিখে ও বিলাসিতা এবং
ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন

জনসাধারণের নৈতিক অবনতি এবং আকিদা-বিব্ষাস ও তমুদ্রুনি বিকৃতির মে সয়লায় প্রায় হয় যা, তা তার জন্য এই কথার সংশোধন করতে পারেন এবং তার কোনো প্রভাব এর ওপর পরিলক্ষিত হয় না।

ইমাম পাজজাহিল (র)

উমর ইবনে আব্দুল আহীরের পর রাষ্ট্রীয় ও রাজনীতির লাগাম স্বায়ত্তে জাহেলিয়াতের হাতে স্বায়ত্ত্বরত হয় এবং বনি উমাইয়া, বনি আব্দাস ও তাদের তুলনায় বংশোদ্ভুত বাদশাহদের কর্তৃত্বে যুগ আরো মহুয়া হয়। এ বাদশাহগণ যে কার্য সম্পাদন করেন, তার সংক্ষিপ্ততার হলো এই যে, একদিকে তারা ত্রী, রোম ও অন্যান্য দেশের জাহেলি দর্শনের হস্তাক্ষর মুসলমানদের মধ্যে চালিয়ে দেন এবং অন্যদিকে নিজেদের অর্থ ও শক্তি বলে জান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংক্রান্তি ও সামাজিকতায় মধ্যে ইসলাম পূর্ব যুগের জাহেলিয়াতের যাবতীয় বিকৃত ব্যবস্থা ব্যাপক প্রচলন করেন। বনি আব্দাসীয় রাজবংশের অবনতির কারণে ক্ষতির পরিমাণ আরো বর্ধিত হয়। প্রথম দিকের আব্দাসীয় খলিফাদের পর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ক্ষমতা যাদের হাতে স্বায়ত্ত্বরত হয়, তারা দীনি ইলম থেকে সম্পূর্ণ বন্ধিত ছিলেন। কাজী ও মুকুতির পদে যোগ্যতার লোক নির্বাচন করার যোগ্যতাতে তাদের ছিল না। নিজেদের মূর্খতা ও আয়ের পরস্পর কারণে শরীয়তের নির্দেশনালী প্রবর্তনের কাজ তারা এমন গতানুগতিক পদ্ধতিতে করতে চাইতেন, যাতে কোনো প্রকার কষ্ট সীমায় প্রয়োজন হয় না।

আর এতে অন্য অনুসারিতার পথই ছিল উপযোগী। উপরের স্বার্থবাদী আলেম সমাজ তাদেরকে ময়হাবী বিতক্ষুদ্র আয়োজনে অত্যন্ত করে তোলেন। অতপর রাজানুরহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় এ ব্যাপ্তি এতদূর বিস্তার লাভ করে যে, এর ফলে সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রে ফরেকাবাজি, মতবিরোধ ও হানাহানি মাহামারি নায়ে প্রসার লাভ করে। আমীর-ওমরাহ ও বাদশাহদের জন্য এ ময়হাবী বিতক্ষুদ্র ছিল মোকারণের লড়াই ও কবরতর বাজার নায়ে নিষ্ক একটি আমল ও বিলাসিতা। কিন্তু সাধারণের জন্য এটি কাছের কাজ করে এবং তাদের দীনি এক্ষেত্রে কেটে টুকরো টুকরো করে দেয়। পঞ্চম শতকে পৌছতে পৌছতে অবস্থা এই পর্যায়ে এসে যায় যে।

১. ত্রী দর্শনের প্রচারের ফলে আকিদা-বিশ্বাসের বৃদ্ধিতে নড়ে ওঠে।

মুহাম্মদ ও ফকিহগণ নায়শাখপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবস্থায় ছিলেন। তাই তারা দীনকে যুগের চাইতে পতনে যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে বৃদ্ধি পাতেন না এবং তীর্থ প্রদর্শনের মাধ্যমে আকিদা-বিশ্বাসের গোমরাহীতে দাবিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। নায়শাখপে যারা বিপুল জনের অধিকারী বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁরা
কেবল ইসলামী শাখা পরাদী ছিল না বরং নায়শাখার ইজতীহাদ করার মতো যোগ্যতা তাদের ছিল না। তারা গীর্জা দার্শনিকদের দাস ছিলেন। সমালোচনার দৃষ্টিতে এ গীর্জা সাহিত্য পর্যালোচনা করার মতো গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন কোনো লোক তাদের মধ্যে ছিল না। গীর্জা 'ওহীকে' অপরিবর্তনীয় মনে করে তারা হবন তাকে গীর্জা করে নেন এবং আসামী ও হীরা গীর্জা 'ওহী' অনুষ্ঠান তাকে মনে করে জন্যে তাকে বিক্ষিপ্ত করতে উদ্দেশী হন। এ পরিস্থিতির কারণে সাধারণ মুসলমান ইসলামের মন্ত্র বিরোধী মনে করতে থাকে। তার প্রত্যেকটি বিষয় তাদের চোখে সমস্ত পূর্বের সামান্য হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। তারা মনে করতে থাকে যে, আমাদের দীন লজ্জাবদ্ধ লতো নায় স্পর্শকাত, বুদ্ধির পরীক্ষার সামান্য সর্বাধিক তা বিশিষ্ট পড়ে। ইমাম আবুল হাসান আশারী ও তাঁর অনুসারীরা এ ধারার পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন। এ দলটি ইলমে অলাভক অবস্থায় ছিলেন কিন্তু নায়শাখার দুর্বলতাগুলো সম্পর্কে তাঁরা মোটেই যাওয়া সহায়তা ছিলেন না। তাই তাঁরা এ ব্যাপার ও সর্ব পর্যায়ের আকিদা বিক্ষিপ্ত গতি পরিবর্তন করতে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। বরং মৌতাজ্ঞালদের প্রতি জিদের বশে তারা এমন অনেক কথা গ্রহণ করেন, যা আসলে দীনী আকিদার অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

২. মূর্ত শাসকদের প্রতাবে এবং দীনী ইলমসমূহ বর্ধিত উপায়-উপকরণের সাহায্য বিক্ষিপ্ত হবার কারণে ইজতীহাদের ধারা শুরু করে। অন্য অনুসারীর ব্যাপক প্রবল হওয়া যুদ্ধের ভিত্তিতে নতুন নতুন ফেরকা সৃষ্টি করে এবং এসব সমালোচনায় পরাপর মুসলমানদেরকে মেনে গেছে। (জলাত অলিকুমের উপর)-এর পর্যায়ে স্থাপন করে।

৩. পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত মুসলিম জাতীয় সর্বত্র নেতিক্ষ অবন্তি দেখা দেয়। কোনো একটি শ্রেণীতে এর প্রভাবশালী থাকেনি। মুসলমানদের সমাজ জীবন কুরআন ও নবুয়াতের আলোক থেকে অনেকাংশে বিগত হয়ে যায়। ইহুদীজ, এবং তাদের সমাজে কৃতোষিত এবং রসূলের সন্তানের দিকে ফিরে আসা উচিত, একথা আলেম সমাজ, আমীর-ওমরাহ ও জনসাধারণ সবই বিবেচনা করে।

৪. রাজধানীর রাজপরিবার ও শাসক শ্রেণীর বিলাসবহুল জীবন যাত্রা ও বার্তাবাদী যুগের কারণে অধিকাংশ স্থলে প্রজাসাধারণ চরম দুর্লভ গোপনীয় ছিলো। অবিশ্বাস্ত বোধ জনানুক প্রকৃতপক্ষে লাভবান করে, সেগুলো ধাঙ্গা ও ক্ষত্রিয় হ্রাস হচ্ছিল।
রাজ দরবারে যেসব শিল্প ময়দাসমপুর ছিল কিন্তু নৈতিক বৃত্তি ও তমুদের
জন্য ছিল ধারক কেবল সেখানেই ভজক হয়েছিল। চারপাশের অবস্থা ও
নিদর্শনসমূহ সম্পূর্ণভাবে ঘোষণা করেছিল যে, ব্যাপক ধাঙ্গের সময় নিখুঁত হবে।

পঞ্চম শতকের মধ্যভাগে এই পরিস্থিতিতে ইমাম গাজালী জন্মগ্রহণ
করেন ১১ সে মুখে যে শিক্ষা পার্থিব উন্নতির বাহন হতে পারতো, প্রথমতঃ,
সেই ধরনের শিক্ষা তিনি লাভ করেন। রাজারে যেসব বিদ্যার চাহিদা ছিল,
তাতেই তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন। অতঃপর এ বস্তুকে নিয়ে তিনি ঠিক
সেখানেই পৌছেন যেখানকার জন্য এটি তৈরি হয়েছিল এবং তৎকালে একজন
আলেম যতদূর উন্নতির কল্পনা করতে পারতেন, ততদূর তিনি পৌছে যান।

তিনি তৎকালীন দুনিয়ার বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় বাগদাদের নেজামিয়া
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর নিযুক্ত হন। নেজামুল মুলক তুসী, মালিক শাহ সালতুকী
ও বাগদাদের “খলিফার” দরবারে যোগ্য আসন লাভ করেন। সমকালীন
রাজনীতিতে এতক্ষণ প্রভাব বিস্তার করেন যে, সালতুকী শাসক ও আবাসীয়
“খলিফার” মধ্যে সূচিত মতবিরোধ দূর করার জন্য তাঁর খেদমত হাসিল করা
হতো। পার্থিব উন্নতির এ পর্যায়ে উপনীত হবার পর অক্সাও তাঁর জীবনে
বিপ্লব আসে। নিজের যুগের তত্ত্বাবধান, নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও তমুদুনির
জীবনধারাকে যত গতিরূপে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন, ততই তাঁর মধ্যে
বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে থাকে এবং ততই তাঁর বিবেক তাঁর ব্যর্থ চীৎকার ওঠে
করে যে, এই পুংসিগৃহায় সমুদ্রে সংঘর্ষ করা তোমার কাজ নয়, তোমার কাজ
অন্য কিছু। অবশেষে সমস্ত রাজকীয় ময়দা, লাভ, মুল্লাফক ও মূর্ধাপূর্ণ
কার্যসমূহকে ঘৃণাভুতে দূরে নিকেপ করেন। কেননা এগুলোই তাঁর পায়ে শিকল
পরিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর ফকির বেশে দেশ পর্যটনে বেরিয়ে পড়েন। বনে-
জংগলে ও নির্জন স্থানে বসে নিরবিচিত্রভাবে চিন্তায় নিমগ্ন হন। বিভিন্ন এলাকায়
সাধারণ মুসলমানদের সংগে মেলামেল করে তাদের জীবনধারায় গতিরূপে
পর্যবেক্ষণ করেন। দীর্ঘকাল মোহাম্মদ ও সাধারণ মাধ্যমে নিজের আঞ্চলে
পরিশুদ্ধ করতে থাকেন। ৩৮ বছর বয়সে বের হয়ে পূর্ণ দশ বছর পর ৪৮ বছর
বয়সে ফিরে আসেন। এই দীর্ঘকালীন চিন্তা ও পর্যবেক্ষণের পর তিনি যে কার্য
সম্পাদন করেন তাহলো এই যে, বাদশাহদের সংগে সম্পর্কের করেন এবং
তাদের মামলায় গৃহে করা বন্ধ করেন। বিবাদ ও বিপর্যস্তে দূরে থাকার
জন্য শপথ করেন। সরকারী প্রভাবাধীনে পরিচালিত শিক্ষার সমস্থানে কাজ
করতে অসুস্থ জাগরণ করেন এবং তুলে নিজের একটি ব্যাধির প্রতিষ্ঠান কায়েম

১১. জন্মগ্রহণ করেন ৪৫০ হিজরীতে (১০৫৫ খৃষ্ট) এবং ৫০৫ হিজরীতে (১১১১ খৃষ্ট) ইত্বেক্কুল করেন।
ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন

করেন। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি নির্বাচিত ব্যক্তির বিশেষ পদ্ধতিতে
তালিম দিয়ে তৈরী করতে চাছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ তার এ প্রচেষ্টা কোনো
বিরাট বৈপ্লবিক কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হয়নি, কেননা এ পদ্ধতিতে কাজ
করার জন্যে তার আয়ু তাকে পাঁচ-ছয় বছরের বেশী অবকাশ দেয়নি।

ইমাম গাজীলাই (র)-এর সংক্ষেপমূলক কাজের সংক্ষিপ্তার হলো এইঃ

এক, গ্রীক দর্শন গতিরূপে অধ্যয়ন করার পর তিনি তার সমালোচনা
করেন এবং এমন জব্দদস্ত সমালোচনা করেন যে, তার যে শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তিমত্তা
মুসলমানদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো, তা হৃদয়ের হয় এবং লোকেরা যে
সমস্ত মতবাদকে চরম সত্য বলে মনে নিয়েছিল, কুরআন ও হাদিসের
শিক্ষাসংহতি যার ফলে ছাড়ে দালাই করা ছাড়া দীনের উদ্বারের আর কোনো
উপায় পরিদৃষ্ট হচ্ছিল না, তার আসল চেহারা অনেকাংশে জনগণের সমুদ্রে
উমুক্ত হয়ে যায়। ইমামের এই সমালোচনার প্রভাব শ্রু মুসলমান দেশসমূহেই
সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং ইউরোপে উপনীত হয় এবং সেখানে গ্রীক দর্শনের
কর্তৃত্ব খতম করার এবং আধুনিক সমালোচনা ও গবেষণা যুগের দ্বারা উদ্ধৃত
করার ব্যাপারে অন্শগ্রহণ করে।

দুই, ন্যায় শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান না রাখার কারণে ইসলামের সমর্থকগণ
দার্শনিক ও মূতকালিমদের মোকাবিলায় যেসব ভুল করছিল তিনি সেগুলো
সংশোধন করেন। পরবর্তীকালে ইউরোপের পাঠ্যে যে ভুল করেছিল ইসলামের
এ সমর্থকরা ঠিক সেই পর্যায়ে ভুল করে চলছিল। অর্থাৎ ধর্মীয় আক্কাদা-
বিশ্বাসের যুক্তি-এমানকে কতক সম্পন্ন অযৌক্তিক বিষয়াবলীর ওপর নির্ভরশীল
মনে করে অথবা সেগুলোকে মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা, অতঃপর ঐ মনোভাব
মূলনীতিগুলোকেও ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাসের মধ্যে শামিল করে যায়। সেগুলো
অর্থীকর করে তাদেরকে কাফের গণ্য করা, আর যে সমস্ত দলিল-এমান, অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মনোভাব ঐ নিতিগুলোর গলন প্রমাণিত হয়,
সেগুলোকে ধর্মের জন্যে বিপদ বর্মণ মনে করা। এ জিনিসটিই ইউরোপে
নাস্ত্র্যাসাদের দিকে ঢেলে দিয়েছে। মুসলিম দেশসমূহে এ জিনিসটিই বিপুল
বিক্রমে কাজ করে যাচ্ছে এবং জনগণের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করছিল। কিন্তু
ইমাম গাজীলাই যথাসময়ে এর সংশোধন করেন। তিনি মুসলমানদেরকে
জানান যে, অযৌক্তিক বিষয়সমূহের ওপর তোমাদের ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাসের
এমান নির্ভরশীল নয় বরং এর পেছনে উপমুক্ত যুক্তি-এমান আছে। কাজেই
ঐগুলো ওপর জোর দেয়া অতি হীন।

www.icsbook.info
তিনি। তিনি ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস ও মূলনীতিসমূহের এমন যুক্তিসম্পন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে কমপক্ষে সে যুগে এবং তার পরবর্তী কয়েক যুগ পর্যন্ত নায়কশালী ভিত্তিক কোনো প্রকার আপত্তি উঠাপিত হতে পারতো না। এই সংগে তিনি শরীয়তের নির্দেশাবলী এবং ইবাদতের গুরুত্ব ও যৌজিকতাতে বর্ণনা করেন এবং এমন একটি চিত্র পেশ করেন যার ফলে ইসলাম যুক্তি ও বৃদ্ধির পরিকার বোঝা বহন করতে পারবে না বলে যে তুল ধারণায় মানুষের মনে স্থান লাভ করেছিল, তা বিদৃষিত হয়।

চার। তিনি সমকালীন সকল মহাবাহী ফরেকা এবং তাদের মতবিরোধ পূর্বরূপে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে ইসলাম ও খুফরের পৃথক-পৃথক সীমারেখা নির্ধারণ করেন এবং কোনো সীমারেখার মধ্যে মানুষের জন্য মত প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করার স্বাধীনতা আছে, কোনো সীমারেখা অতিক্রম করার অর্থ ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া, ইসলামের আসল আকিদা-বিশ্বাস কি কি এবং কোনো জিনিসকে অনর্থক ইসলামী আকিদার মধ্যে শামিল করা হয়েছে তা বিবৃত করেন। তাঁর এ পর্যালোচনার ফলে পরস্পর বিবদ্ধমান ও পরস্পরকে কাফের আখ্যাদানকারী ফরেকাসমূহের সুড়ঙ্গের মধ্যে হতে অনেক বারবু বের হয়ে যায় এবং মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়।

পাঁচ। তিনি দীনের জনকে সজ্জিতি ও সতেজ করেন। চেতনাবিনীহীন ধারিকতাকে অধিকারী গণ্য করেন। অন্য অনূর্ধ্বসময়ের কঠোর বিরোধিতা করেন। জনগণের পুনর্বার খোদার কিতাব ও রসূলের সুন্নের উৎস ধারার দিকে আকৃষ্ট করেন। ইজিতহাদের প্রাণ শক্তির সজ্জিতি করার চেষ্টা করেন। এবং নিজের যুগের প্রাণ প্রত্যেকটি দলের ভ্রান্তি ও দূরবর্তী সমালোচনা করে তাদেরকে ব্যাপকভাবে সংশ্লীতের আহ্বান জানান।

ছয়। তিনি পুরাতন জরাজীর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করেন এবং একটি নয়া শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা পেশ করেন। সে সময় পর্যন্ত মুসলিমদের মধ্যে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন ছিল, তার মধ্যে দু ধরনের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়ছিল। প্রথমটি হলো এই যে, দীন ও দুনিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা পৃথক ছিল। এর ফলে নবী দীন ও দুনিয়ার মধ্যে পৃথকীকরণ দেখা যায়। ইসলাম এটিকে মূলতঃ আত্ম মনে করে। দ্বিতীয়টি এই যে, শরীয়তের জন হিসাবে এমন অনেক বিষয় পাঠ্য তালিকাতৃত্ব ছিল, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এর ফলে দীন সম্পর্কে জনগণের ধারণা ভানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং কতিপয় অগ্রগণ্য বিষয় গুরুত্ব অর্জন করার কারণে ফিরিকাত বিদ্রোহ গুরুত্ব হয়। ইমাম জামালী (র) এ গলা দূর করে একটি সুসামগ্রী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর
সমকালীন লেকরা তাঁর এ মহান কর্মকাণ্ডের যোগ বিবেচিত করে। কিন্তু অবশেষে সকল মুসলিম দেশে এ নীতি দীর্ঘকাল লভ করে এবং পরবর্তীকালে যতগুলো শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তার সবগুলোই ইমাম নির্ধারিত পথেই প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানকাল পর্যন্ত আরবী মদাসাসমূহের কারীকুলামের যে সমস্ত বই শামিল আছে, তার প্রাথমিক নৃশী ইমাম গাজ্জালী (র) তৈরি করেন।

সাত, তিনি জনসাধারনের নৈতিক চরিত্র পূর্ণরূপে পর্যালোচনা করেন। উলামা, মাঝা রেখ, আমির-ওমরাহ, বাদশাহ ও জনসাধারনের প্রত্যেকের জীবন প্রাণী অধ্যয়নের সুযোগ তিনি পান। নিজে পরিভাষণ করে প্রাচী জগতের একটি অংশের অবস্থা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর এই উল-উলুম কিভাবে এই অধ্যয়নের ফল। এ কিছুতে তিনি মুসলমানদের প্রত্যেকটি শ্রেণীর নৈতিক অবস্থার সমালোচনা করেন, প্রত্যেকটি দৃষ্টির মূল এবং তার মনস্তাত্ত্বিক ও তত্ত্বাবধানের কারণসমূহ অসংক্রান্ত করেন এবং ইসলামের নির্ভুল ও স্ত্রীলাভ নৈতিক মানদণ্ড পেশ করার চেষ্টা করেন।

আট, তিনি সমকালীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবীর্ত সমালোচনা করেন। সমকালীন শাসক গোষ্ঠীকেও সরাসরি সংশোধনের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকেন এবং এ সংগে জনগণের মধ্যে যুলুম-নির্ধারিতের সুযোগ ব্যবহার নত না হয়ে অবীর্ত সমালোচনা করার প্রণয়ন সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। ‘এই উল-উলুম’ এর একটিই লেখন ৪ ‘আমাদের জাতীয় সুলতানদের সমস্ত বা অধিকাংশ ধন-সম্পদ হারাম।’ আর একটিই লেখন, “এ সুলতানদের নিজেদের চেহারা অন্যকে না দেখানো উচিত এবং অন্যদের চেহারা না দেখা উচিত। এদের যুলুমকে দৃষ্টি করা এদের অভিপ্রেত পছন্দ না করা; এদের সংগে কোনো প্রকার সম্পর্ক না রাখা এবং এদের সংগে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের থেকেও দূরে অবস্থান করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অপরীভাব।” অপর একটিই লেখন দরবারে প্রচলিত আদব-কায়দা ও বাদশাহ পূজার সমালোচনা করেন এবং বাদশাহ ও আমির-ওমরাহের অনুসরণ সামাজিক রীতিনীতির নিন্দা করেন, এমনকি তাদের দালান-কোঠা, পোশাক-পরিধিঃ গৃহের সাজসজ্জার সব কিছুকেই নাপাক গণ্য করেন। সে কথায় এখনই কিছু হনি বলে তিনি নিজের যুগের বাদশাহদের নিকট একটি বিভাগীর পত্র লেখেন। প্রস্তাব মাধ্যমে তাঁকে ইসলাম প্রবর্তিত রাষ্ট্র প্রত্যেক দিকে আদর্শ জানান, শাসকের দায়িত্ব বুঝান এবং তাঁকে জানান যে, তাঁর দেশে যে যুলুম হচ্ছে তা তিনি নিজেই করেন বা তাঁর অধীনস্ত কর্মচারীরা করেন, সবকিছুর জন্যে তিনিই দায়ি। একবার বাধা হয়ে রাজ দরবারে যেতে হয়, তখন আলোচনা প্রসঙ্গে বাদশাহের মুখের ওপর বলেন।
"স্বর্ণ অলঙ্কারের ভাঙ্গার তোমার ঘোড়ার পিঠ ভাঙ্গার তো কি হয়েছে, অনাহার-অর্থাহার মুসলমানদের পিঠতে ভেঙে গিয়েছে।"

তার শেষ যুগে যে সকল উজির নিযুক্ত হন, তাদের প্রায় সবার নিকট তিনি পত্র লেখেন এবং জনগণের দূরবস্থার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনৈক উজিরকে লেখেন:

"মুলাম সীমা অতিক্রম করেছে। যেহেতু আমাকে স্বচ্ছতা এসব দর্শন করতে হতো, তাই নির্লজ্জ ও নির্দোষ যালেমদের কীর্তিকলাপ প্রত্যাশা না করার জন্যে প্রায় এক বছর থেকে আমি তুমির আবাস উঠিয়ে নিয়েছি।"

ইবনে খালদুনের বর্ণনা মতে এদলো জানা যায় যে, তিনি পৃথিবীর যে কোনো এলাকাতেই হেক না কেন, নির্ভরে ইসলামী নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করতেন। কাজেই তাঁর ইতিহাস দূর প্রতিরূপে (আফিকায়) তাঁর জনৈক ছাত্র "মুওয়াহিদ" রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ইমাম গাজালীর কর্মকাণ্ডে এই রাজনৈতিক রূপ ও রাষ্ট্র নেই এটি গৌণ ছিল। রাজনৈতিক বিপ্লব সাধনের জন্যে তিনি কোনো নিয়মানুসারে আন্দোলন চালাননি এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার ওপর সমান তাত্ত্বিক বিনিময় করতে সক্ষম হননি। তাঁর পরবর্তীকালে জাহেলিয়াতের কর্তৃত্বাধীনে মুসলিম জাতি-সমূহের অবস্থা উন্নত ও অবনতির দিকে অগ্রহযোগ্য হতে থাকে। এমনকি এক শাতাধীন পর তাতারীরা তুফানের ন্যায় মুসলিম দেশসমূহের ওপর দিয়ে ছুটে চলে এবং তাদের সম্পর্ক তমুদুনকে বিক্ষত করে দেয়।

ইমাম গাজালীর (র) সংক্ষিপ্তমূলক কাজের মধ্যে কতিপয় তত্ত্ব ও চিন্তাগত ক্রটিও ছিল। এগুলোকে তিনি ভাঙ্গে ভাঙ্গ করা যেতে পারে। হাদিস শাস্ত্রে দূরবস্থা হবার কারণে তাঁর কার্যবাহীতে এক ধরনের ক্রটি দেখা দেয়। ১২ তৃতীয় ধরনের ক্রটি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির ওপর যুক্তিবাদীতা ও নায়ক শাস্ত্রের কর্তৃত্বের কারণে সৃষ্টি হয়। তৃতীয় ধরনের ক্রটির উৎপত্তি হয় তাসাউফের দিকে প্রয়োজনাত্তিক লুঁকে পড়ার কারণে।

এ দূরবস্থা লুকো কাজটি উঠে ইমাম গাজালী (র)-এর আসল কাজ অর্থাৎ ইসলামের চিন্তাগত ও নৈতিক প্রাণবিধিকে সংরক্ষিত করার এবং বেদান্ত ও গোমরাহের বিদ্যমানকাল চিত্ত জগত ও তমুদুনকের জীবনধারা থেকে ছাড়াই করার কাজকে যিনি অস্পর্শ করেন তিনি হচ্ছেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)।

১২. ইমাম গাজালী তাঁর এইচআইয়া-উলআম কিভাবে এমন অনেক হাদিস উদ্ধৃত করেছেন, যে গুলোর সন্দর্ভ পাওয়া যায় না, তাজদ্দি সাহাবী তাঁর তারকাতে শাকেইয়ায় সেগুলো একিত্তি করেছেন।-(দেওয়া-তাবকাত চূড়া খৃ, পৃঠা-৫২৫ থেকে ১৮২)
ইবনে তাইমিয়া (র)

ইমাম গাজ্জালী (র)-এর দেড়শে বছর পর হিজরী সপ্তম শতকের দ্বিতীয় দিকে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাতারীদের হামলায় সিপ্তু নদ থেকে নিয়ে ফোরাত নদীর তীরভূমি পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড মুসলিম জাতি বিধিনী হয়ে গিয়েছিল। এখন তারা সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। অনবরত পঞ্চম বছরের এ পরাজয়, নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্ক, অশ্বাসীতি ও বিশ্বংশলাপূর্ণ অবস্থা এবং বিদ্যা, সভাস-সংগঠিত কেন্দ্রসমূহের ধার্মিক মুসলমানদেরকে অবনতির অতল গহবরে নামিয়ে দিয়েছিল। ইমাম গাজ্জালীও তাদের মধ্যে একটা অবনতি প্রত্যক্ষ করেননি। নয়া তাতারী আক্রমণকারী যদিও ইসলাম কর্তৃ করেছিল কিন্তু জাহেদীয়দের ব্যাপারে এ শাসনকরণ এদের পূর্ববর্তী তুর্কি সাহসদের চাইতে কয়েক পদ অগ্রসর ছিল। তাদের প্রতিবেদনে এসে জাগরণ, আলেম সমাজ, মাশায়েথ, ফাকিহ ও কাজীগণের নৈতিক চরিত্রের আলোচনা আরো বৃহত্তর অধ্যাপক হতে থাকে।

১৪ অনুসন্ধান একবার প্রায় যায় যে, তার ফলে বিভিন্ন ফিকাহ ও কালাম শাস্ত্রীয়র মহাবহসমূহ বেশ স্বতন্ত্র

১৩.৩ হিজরীতে (১২২২ খ্রীস্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ইতেমাদুল্লাহ জন্মগ্রহণের মাঝে ৭৬৬ হিজরীতে (১৩২২ খ্রীস্টাব্দ)।

১৪. তৎকালীন আলেম সমাজের অবস্থা এই সময় তুর্কিগণের ছিল যে, হলাকু খান বাগ্নাদ দখল করার পর আলেমের নিকট নায়ক রায়শদের মুসলমানদের মধ্যে পঞ্চম পর্যন্ত নায়ক তুর্কিগণের নিকট মুসলমানদের মহাবহল রায়শদের ঘণ্টায় যাতায় কাব্য তাদের মধ্যে আলেম সমাজ শাস্ত্রীয় মুসলমানদের মধ্যে আস্ত করায় দুর্গুণ প্রচুর রায়শদের মধ্যে একমাত্র মুসলমান দ্বিতীয় অর্থনৈতিক মুসলমানদের মাঝে নিহিত এবং তাদের শাসন এসে জাগরণ হয়ে যায়।

বিভিন্ন রায়শদের কেন্দ্রে মুসলমান সমাজের মধ্যে অধিকাংশ এবং বিভিন্ন পাদদেশের মুসলমান কেন্দ্রে দুর্গুণ প্রচুর রায়শদের মধ্যে এফাল প্রচুর রায়শদের মধ্যে একমাত্র মুসলমান দ্বিতীয় অর্থনৈতিক মুসলমানদের মাঝে নিহিত এবং তাদের শাসন এসে জাগরণ হয়ে যায়।

বিভিন্ন রায়শদের কেন্দ্রে মুসলমান সমাজের মধ্যে অধিকাংশ এবং বিভিন্ন পাদদেশের মুসলমান কেন্দ্রে দুর্গুণ প্রচুর রায়শদের মধ্যে একমাত্র মুসলমান দ্বিতীয় অর্থনৈতিক মুসলমানদের মাঝে নিহিত এবং তাদের শাসন এসে জাগরণ হয়ে যায়।
দীনে পরিণত হয়। ১৫ ইজতিহাদ গোনাহে পরিণত হয়। বেদান্ত ও পৌরাণিক বিষয়াবলী শরীয়তের বিষয়ে পরিণত হয়। কুরআন সূচনাতে আঁকড়ে ধরা অমার্জিনী গোনাহ বলে বিবেচিত হয়। তৎকালে অশিক্ষিত ও গোমরাহ জনসাধারণ, দুনিয়া পৃজ্ঞার বা সংকীর্ণমন্ত্রী আলম সমাজ ও মূর্ত্য বয়েলক শাসক শ্রেণীর ভয় সমিলন এমন জোরদার ওষুধবাদীর হয়ে ওঠের যে, এ সম্বন্ধে জোটের বিরুদ্ধে কারার সংস্কার ও সংশোধনের প্রেরণায় নিয়ে অসাধ্য হওয়া কমাইর ছুরির নীচে নিজের গলা বাড়িয়ে দেয়ার চাইতে কিছু কম ছিল না। এ কারণেই যদিও তখন নির্ভুল চিন্তার অধিকারী, ব্যাপক দৃঢ়সম্পন্ন ও সত্য উপলব্ধিকারী ওলামার অভাব ছিল না এবং হকের পথে অসাধ্য সত্যানুসারী ও আসল সত্যীর সংখ্যায় যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এসব সতীতে সেই অনন্যকার যুগে সংস্কারের আঘাত বৃদ্ধি করায় সাহস একজন নাম আল্লাহর বাদার হয়েছিল।

ইবনে তাইমিয়া (র) কুরআনে গভীর জানের অধিকারী ছিলেন। এমন কি হাফজে যাহী (র) সাক্ষা দেন যে, আমার তফসিল ফসলের যেটি ইবনে তাইমিয়া (র) বিপুল জানের অধিকারী ছিলেন। তিনি হাদীসের ইমাম ছিলেন। এমন কি বলা হয়ে ছিল যে, (কল হুদীসটি ইবনে তাইমিয়া জানেন না, সেটি আদতে হাদীসের নয়)। ফিকহ শাখার তার জান এর গভীর ছিল যে, নিসন্দেহে তিনি তার সত্য যুগুহসারের মর্যাদা লাভ করেন। মুফতি শাখা ও কালাম শাখার তার দৃষ্টি এর গভীর ছিল যে, সমকালীন আলমেদের মধ্যে এবং শাখার নিজেদের গভীর জান সম্পর্কে যাদের গবেষণা ছিল তার বিতর্ক নিকট শিখে গণ্য হতেন। ইহুদী ও পৃথিবীভূত সাহিত্য, তাদের ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের বিরোধ সম্পর্কে তার দৃষ্টি এতই প্রখর ছিল যে, গোমড় জীবনের মতে যে ব্যক্তি তারাতে উপলব্ধি ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে আলোচনা করতে চায়, তাকে অন্য ইবনে তাইমিয়ার গবেষণার মুখাপেক্ষা হতে হবে। এসব গভীর তত্ত্বজানের সাথে সাথে তার সাহস ও হিমতের তুলনা ছিল না। সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কখনো কোনো বৃহত্তর শক্তিতে তিনি তারি সাহস ও হিমত তুলনা ছিল না। সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কখনো কোনো বৃহত্তর শক্তিতে তিনি তারি সাহস ও হিমত তুলনা ছিল না। এমন কি এর পরিপূর্বক কাজকে তিনি অধিকতর নিপুণতার সাথে অগ্রসর করতে সক্ষম হন।

১৫. এ পরিস্থিতি উপলব্ধি করার জন্যে উপরে একটি নমুনা যথাই। নামকর একটি মোদাসার (মোদাসারের রাওয়ানহী) প্রতিষ্ঠাতা নিজের ওয়াজফনামায় লিখে রেখেছিলেন যে, এ মোদাসার ঈসাই, ইহুদী ও হাজারীরা ভীত হতে পারবে না এ তবেরকে আদালত করা যেতে পারবে যে, ফিকহ ও কালামের কৃত্যনির্ণয় বিষয় সম্পর্কে বিতর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেয়েছিল, যার ফলে একজন শাফতী ও আশায়ী (কালাম শাখার জনক ইমাম আবুল হাসান আশায়ীর সমর্থক) ইমাম আহমদ ইবনে হাসানের অনুসারীদেরকে ইহুদী ও ঈসাইর সাথে শামল করতে দিয়ে করতেন না।
ইবনে তাইমিয়া (র)-এর সংখ্যারমুকক কার্যালায় সংক্ষিপ্ত সার হলো:

১. তিনি ইমাম গাজ্জালীর চাইতেও অনেক বেশী কঠোর ও তীব্রভাবে গ্রীক যুক্তি ও দর্শন শাস্ত্রের সমালোচনা করেন এবং তার দুর্বলতাসমূহ এমনভাবে প্রকাশ করেন যার ফলে যুক্তি ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে তার অধিপত্য চিরকালের জন্য দুর্বল হয়ে পড়ে। এই ইমামদের সমালোচনার প্রভাব কেবল প্রাচ্য দেশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা পাশাপাশি পৌছে। কেননা ইউরোপ এরিষটলের যুক্তিবাদিতা ও নীতিন্থার ধারণাগুলোর গ্রীক প্রভাবিত দার্শনিক ব্যবস্থার বিক্রিয়া সর্বপ্রথম সমালোচনার আওয়াজ ওঠে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার আড়াইশো বছর পর।

২. ইসলামী আকিদা-বিবেক্ষায়, হ্রুম-আহ্কাম ও আইন-কানুনের সমর্থনে তিনি এমন জোরদার যুক্তি প্রমাণের অবস্থান করেন, যা ইমাম গাজ্জালীর যুক্তি-প্রমাণের চাইতেও বেশী বুদ্ধিমান ছিল এবং ইসলামের সত্যিকার প্রাণকর্তৃর ধারক হবার দিক দিয়ে তাঁর থেকে অনেক বেশী অগ্রবর্তী ছিল। ইমাম গাজ্জালী (র)-এর বর্ণনা ও যুক্তি নির্ভরের ওপর পরাইভাষিক যুক্তি শাস্ত্রের বিপুল প্রভাব ছিল। ইবনে তাইমিয়া (র) এ পথ পরিহার করে সাধারণ জনের ওপর বর্ণনা, প্রকাশ ভঙ্গি ও যুক্তি প্রদর্শনের ভিরিতস্বাপন করেন। এটি অধিকতর স্বাভাবিক, অধিকতর প্রক্ষেপশালী এবং কূরআন ও সুন্নাতের অধিকতর নিকটবর্তী ছিল। এ নতুন পথটি পূর্ববর্তী পথগুলো থেকে সম্পূর্ন ভিন্নতা ছিল। যারা দীর্ঘায় ধারক ও বাহক ছিলেন, তারা কেবলমাত্র শরীয়তের নির্দেশাধারী উদ্দুর্ব করতেন, সেগুলো বুদ্ধি পারতেন না। আর যারা কালাম শাস্ত্রের গোলক ধারণ আকাশকে পড়েছিল, তারা দর্শন শাস্ত্রের কাচকৃত ও পারিভাষিক যুক্তিশাস্ত্রের মাধ্যমে বুদ্ধিবাদ চেষ্টা করার কারণে কূরআন ও সুন্নাতের উচ্চতর প্রাণবৃত্তকে কমবেশী হারিয়ে ফেলেছিলেন। ইবনে তাইমিয়া (র) ইসলামী আকিদা-বিবেক্ষায় ও শরীয়তের নির্দেশাধারীকে তার আসল প্রাণবৃত্তকে পুরোপুরি বিবৃত করেন। অতঃপৰ সেগুলো বুদ্ধিবাদ জন্য এমন সোজা ও স্বাভাবিক পথ অবলম্বন করেন, যার সমুদ্রে মাঝান করা ছাড়া বুদ্ধির জন্যে দ্বিতীয় কোনো পথ ছিল না। ইসলামের এ মহান কার্যের প্রশংসা করেন গিয়ে হাদিসের ইমাম আল্লামা হাতাবী বলেন।

ওল্ড ফেস সেন্টার মুহাম্মদ উদ্দীন উদ্দীনের শরীয়তের আলোচনায় এই প্রশংসা করেন।

ওমর লম ব্যাপারে বলেন:

অর্থাৎ ‘ইবনে তাইমিয়া নির্ভরজাত সুন্নাত ও পূর্ববর্তীগণের পদ্ধতি সমর্থন
করেন এবং এর সমর্থনে এমন সব যুক্তি-প্রমাণ ও এমন পদ্ধতির আশ্রয়
গ্রহণ করেন যার দিকে ইতিপূর্বে কারোর দৃষ্টি পড়েনি।’

www.icsbook.info
৩. তিনি শুধু অন্ধ অনুসৃতির প্রতিবাদ করেই ক্ষত হননি বরং ইসলামের প্রথম মূলের মুক্তিদাতার্থের অনুসৃত পথে ইজতিহাদ করেও দেখিয়ে দেন। তিনি কুরআন, সুন্না ও সাহাবাদের জীবন থেকে সরাসরি প্রমাণ সংগ্রহ করে এবং বিভিন্ন ফিকাহ ভিত্তিক ময়মন মতবিরোধের স্থায়ী ও ন্যায় ভিত্তিক পর্যালোচনা করে অসংখ্য বিষয়ের অবতারণা করেন। এর ফলে ইজতিহাদের পথ নতুন-ভাবে আবিষ্কৃত হয় এবং লোকেরা ইজতিহাদ শক্তির ব্যবহার পদ্ধতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এই সংগে তিনি ও তার মহান শাগরিদ ইবনে কাইমের শরীয়তের হিকমত এবং নবী করিম (স)-এর আইন প্রণয়ন পদ্ধতির উপর এমন সুচক গবেষণা কার্য সম্পাদন করেন যে, তার দৃষ্টিতে শরীয়তের ইতিপূর্বকার সাহিত্যে বিরল। তাদের পর যারা ইজতিহাদ করেছেন তাদের জন্য এ সাহিত্য উত্তম পথপ্রদর্শনের কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে।

৪. তিনি বেদানাত, মুশরকি রসম রেওয়াজ এবং আকিদা-বিশ্বাস ও নৈতিক ব্যবক্তিতে বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেন। এজন্য তিনি কাঠিন বিপরীতের সমুদ্রীন হন। ইসলামের পরিক্ষা বরণরীতিতে এ পর্যন্ত যতগুণে অন্যাবলী নোটের মিশ্রণ ঘটেছিল ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার কোনো একটিকেও নির্দৃশ্বত দেননি। তাদের প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে তিনি কঠোর সংগ্রাম চালান এবং প্রত্যেকটিকে হেটে বের করে দিয়ে নির্ভর ইসলামের পদ্ধতিকে পৃথকভাবে দুনিয়ার সমুদ্রে পেশ করেন। এ সম্প্রদায়ের প্রতিরূপ ইসলামের ক্ষেত্রে তিনি করার প্রতি পক্ষপাতিত করেননি। বিরুদ্ধ ক্ষুদ্রীমান ও কীর্তিমান পুরুষ—যাদের ক্ষুদ্র ও কীর্তির ডাক্তা সম্প্রদায় মুসলিম দুনিয়ার বাজতো, যাদের নাম থেকে মানুষের মাথা নত হয়ে আসতো—তারা ইবনে তাইমিয়ার সমালোচনা থেকে রেহাই পাননি। এমন অনেক কার্য ও পদ্ধতি যা, শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করেছিল, যাদের বৈশ্বিক বরং মুক্তিকালীন হওয়ার স্পষ্ট যুক্তি প্রমাণ তৈরী করা হয়েছিল এবং হরমপর আলেম সমাজে যে ব্যাপারে দুর্বলতা প্রদর্শন করেছিল, ইমাম ইবনে তাইমিয়া সেখানে পুরোপুরি ইসলাম বিরোধী হিসেবে পরিগণিত করেন এবং জেরেশেরে তাদের বিরোধিতা করেন। এই মুক্তি ও সত্য কথনের কারণে দুনিয়ার একটি বিপুল বিরুদ্ধ অংশ তাঁর শক্তির পরিপূর্ণ হয় এবং তাদের শক্তির জের আলো চলে আসেছে। তাঁর সমকালীন লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে তাঁকে একাধিকবার কারাগারে পাঠান, আর পরবর্তী তাঁর বিরুদ্ধে কুফ্রী ও গোমরাহির ফতোয়া প্রদান করে নিজেদের কলিজার ঠাণ্ডা করেন। কিন্তু নির্ভেজাল ও সত্যিকার ইসলামের আনুগত্যের যে শিখা তিনি ফুঁকছিলেন তার বদৌলতে সমগ্র দুনিয়ায় একটি স্বায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়—তার প্রতিক্রিয়া আজও শুরুত হচ্ছে।

www.icsbook.info
ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন

এ সংক্রামক কার্যক্ষেত্রের সাথে সাথে তিনি তাতারীদের বররতা ও পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্বাক্তি করে সংঘাত ক্ষেত্রেও অবহিত হন। তৎকালে মসর ও সিরিয়া এ সয়লাবের আওতামুক্ত ছিল। ইমাম ইবনে তাইমিয়া সেখানকার সাধারণ মুসলমান ও বিতর্কি মুসলিমদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসী জাগি তোলেন এবং তাদেরকে তাতারীদের বিরুদ্ধে সংঘাতে অবহিত করেন। তাঁর সমকালীন লোকেরা সাক্ষা দেয় যে, মুসলমানরা তাতারীদের ভয়ে এতই সত্যর থাকে যে, তাদের নাম আরেক কেপে উঠতো এবং তাদের বিরুদ্ধে সংঘাত ক্ষেত্রে অবহিত হতে ভয় করতো।

কানামা সালামেন আল-মুতাবার কিন্তু ইবনে তাইমিয়া তাদের মধ্যে জেহাদের আওতার প্রজ্জলিত করে তাদের সুপ্রেম অবহিতে জাগিয়ে করেন। তবুও একথা যে, তিনি এমন কোন রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হননি যার ফলে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিপ্লব সৃষ্টি হতো এবং কর্তৃত্বের চারিকার্তা জাহেলিয়াতের হাত থেকে ইসলামের হাতে স্থানান্তরিত হতো।

শায়খ আহমদ সরহিদী (র)

হিজরী সপ্তম শতকে তাতারী ফিতনা হিন্দুকুশ পর্বতের ওদিকের সমুদ্র তৃণোত্তর নেতাবাদ করে দেয় কিন্তু হিন্দুকুশ তার অতুল্য ঢেক থেকে রেহাই পায়। ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কারণে এখানকার সুরধি ও নেন্দ্র সমাজের মনে ভাস্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। দুনিয়ার বাহিক চাকচিকে মূর্ত বাহিক হামেশাই এ ভাস্ত ধারণার সমস্ত হয়েছে। খোরসান ও ইরাকের যাবতীয় দৃশ্য এখানে বালি হতে থাকে। এখানেও চলে বাদশাহের কাছাকাছি কর্তৃত্ব।

আমির ওমরাহ ও বিতর্কি মুসলিমদের বিদান হয়। অন্যায় অধিকার ও অন্যায় পথে বাস্ত এবং মুল্লম নির্যাতনের রাজত্ব অবধি চলে থাকে। খোদা সম্পর্কে গাফতি ও দীনুর সহজ-সরল পথ থেকে দূরে অবস্থান করার নীতি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে বাদশাহ আকবরের শাসনামলে পৌছে গোমরাহী তার শেষ সীমায় উপনীত হয়।

আকবরের দরবারে এ ধারণা অত্যন্ত প্রবল ও ব্যাপক ছিল যে, ইসলাম মূর্তি ও অম্বরিক রুদ্রদের মধ্যে জন্মাত্ম করেছিল। তা কোনো সুসম্ভাব্য ও সংক্রান্তিবাদ জাতির উপযোগী না। নবুয়াত, ওহি, হাশর-নশর, বেহেশত ও দোখু প্রভৃতি ইসলামের মূল আকিদা-বিশ্বাসসমূহ বিদ্রোহের বস্তুতে পরিণত হয়। কুরআন খোদার কালামে বহু ব্যাপারে সম্মুহ পোষণ করা হয়। ওদির অবতরণ রুদ্র বিজ্ঞানী গণ্য হয়। মৃত্যুর পর শান্তি ও পুরস্কার অধিক্ষিত হল বিচিত্র হয়। তবে জনাশ্রয়বাদ সকল দিক দিয়েই সমস্ততে ও সত্য বলে।
গৃহীত হয়। নবীর মিয়াজকে প্রকাশে অসংখ্য গণ্য করা হয়। নবী করিম (স)-এর ব্যক্তিগতের সমালোচনা করা হয়। বিশেষ করে তাঁর সহস্থমতীদের সংখ্যা ও তাঁর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত জেহাদসমূহের বিরুদ্ধে প্রকাশে আপত্তি করা হয়। এমন কি ‘আহমদ’ ও ‘মুহাম্মদ’ শব্দও বিরক্তির ঠেকে এবং যাদের নামের সাথে ঐ শব্দের ম্যুক্তি ছিল, তাদের নাম পরিবর্তন করা হয়। বার্থবাদী আলেমগণ নিজেদের বইপত্রের ভূমিকায় নাট লেখা বন্ধ করে। অনেক বার্থবাদী গোষ্ঠীর চরম সীমানায় উপনীত হয়ে দাজ্জলের চিহ্নিত মহান নেতা হয়ে সমগ্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ উয়া সাল্লামের মধ্যে আবিষ্কার করে।

"বাল্লাহে আবিশাইলে, শাহী দেওয়ানখানায় নামায় পড়ার মতো বুকের পাটা কারার ছিল না। আবুল ফজল নামায়, রোমা, হজ্জ ও অন্যান্য ইসলামী ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে কঠোর আপত্তি উপস্থাপন করে এবং এগুলোকে উপহাস করে। কলকাতার শহীদের নিদর্শন করা রচনা করে। এবং কাব্য-কবিতা সাহারাই মানুষের নিকট দেখায়।"

বাহাই মতবাদের ভিত্তিও আসলে আকবরের জামায়া স্থাপিত হয়। এ সময়েই এমত পেশ করা হয় যে, মুহাম্মদ (স)-এর এক হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এ দীনের মেয়াদও ছিল এক হাজার বছর। তাই বর্তমানে এ দীন বাতিল হয়ে গেছে এবং এর স্থলে এখন নতুন দীনের প্রয়োজন। মুদ্রার মাধ্যমে এ মতবাদের প্রচার শুরু হয়। কেননা সে যুগে এটি ছিল প্রচারণার সংক্ষেপে শক্তিশালী মাধ্যম। অত্যন্ত একটি নয় দীন ও একটি নয় শরীয়তের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মকে মিলিয়ে একটি মিশ্রিত নতুন ধর্ম তৈরি করা যাতে করে সরকারের শাসন শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

দরবারের তোষায়োডাকারী হিন্দুরা নিজেদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে ভিত্তিশালী জনাতা থেকে যে, অমুক যুগে একজন গোষ্ঠীর মহাযুদ্ধবাদ জন্মাইয়া করতেন। অনুরোধেই অর্থ পূর্ণ আলেমগণ ও আকবরকে মেহদী, যুগপূর্খ, মুজতাহিদ, ইহবান প্রতৃতি প্রমাণ করার চেষ্টা করে। জনৈক তাজুল আরেফিন সাহেব এতদান অগ্রসর হন যে, তিনি আকবরকে আদর্শ মানব ও যুগে নেতা হবার কারণে তাকে খোদার প্রতিষ্ঠ বলে প্রচার করেন। সাধারণ মানুষকে রুখার জন্যে বলা হয় যে, সত্য ও সত্যের (বিশ্বজগত সত্য) দুলিয়ার সকল ধর্মের মধ্যেই আছে। কেননা একটি স্তর ধর্ম সত্যের ইহাদাদার নয়। কাজেই সকল ধর্মে এমন সত্য আছে সেগুলোর সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি প্রণয়ন করা উচিত। জনগণকে ব্যাপকভাবে সেদিকে আহ্বান করতে হবে, যাতে করে সকল ধর্মের বিবৃদ্ধির অবসান ঘটে। এ পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির নাম ‘দীনে ইলাহি’। ‘লা-ইলাহা ইল্লাহাল্লাহ','www.icsbook.info
আকবর খলিফাতুল্লাহ। এই নতুন ধর্মের কালেমা নির্ধারিত হয়। যারা নতুন
ধর্মে প্রবেশ করতো, তাদেরকে তাদের পিতা-প্রিয়তাদের নিকট থেকে আগামী
দীন ইসলাম থেকে তোমরা করে দীনে ইলাহী আকবর শাহী'-এর মধ্যে প্রবেশ
করতে হতো। আর দীনে ইলাহীতে প্রবেশ করার পর তাদেরকে 'চেলা' আখ্যা
দেয়া হতো। সালামের পদ্ধতি পরিবর্তন করে নিয়ম করা হয় যে, সালামকারী
আল্লাহ আকবর ও জবাবদাতা 'জালাল জালালুদ্দিন' বলবে। মনে রাখবেন, বাদশাহের
নাম জালালুদ্দিন ও তাঁর উপাধি ছিল 'আকবর'। চেলাদেরকে বাদশাহর চিত্র
দেয়া হতো, তারা সেটি পাগড়ির গায় লাগিয়ে রাখতো। রাজপুত্রা এ ধর্মের
একটি অংশ ছিল। প্রত্যেক দিন সকালে বাদশাহর দর্শন লাভ করা হতো।
বাদশাহকে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করার পর তাঁকে সিজদা করা হতো।
আলেম ও সুফি তাঁদের কামনা-বাসনা পূরণের এ কেবল ও কাবাকে বেধড়ক সিজদা করতো এবং এ সুপ্তি শেষকে 'সমানের সিজদা' ও 'মুষ্টিকা
চুষ্ট'-এর নামে শেষের আবরণে চেকে রাখতো। নবী (স) এ অভিশপ্ত
বাহানাবাজী সম্পর্কে ভবিষ্যতী করেন যে, এমন এক যুগ আসবে যখন
লোকেরা হারাম জিনিসের নাম পরিবর্তন করে তাকে হালাল বলে গণ্য করবে।

এ নতুন ধর্মের ভিত্তিস্থাপন করার সময় বলা হয়েছিল যে, পক্ষপাতীকে
ভাবুক ডরমের তালো কথাগলো এতে গ্রহণ করা হবে; কিন্তু আপনি
ইসলাম ছাড়া প্রমুখ ধর্মের এতে স্থান হয়। এবং একটি ইসলাম ও ইসলামী
আইন কানুনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্যে সৃষ্টি করা হয়। অগ্নি উপাসনদের নিকট
থেকে অগ্নি পূজাকে গ্রহণ করা হয়। আকবরী মহলে চিন্তামীল্লার আগন্তু
জালান হয় এবং বাতি জলাবার সময় সমানের সঙ্গে দাড়াবার নীতি প্রচলন করা হয়।
ঈসাইয়ের নিকট থেকে ঘটা বাজানো, তিন প্রভু প্রতিকৃতির পূজা এবং এ
ধরনের অভিপ্রায় জিনিস গ্রহণ করা হয়। সবচাইতে বেশী মেহেরবানী করা হয়
হিন্দু ধর্মের ওপর। কেননা এটি ছিল দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্ম এবং
রাজশাহীর নিকট শক্তির করার জন্য একে তোলায় করার প্রয়োজন ছিল।
কাজেই গুরু গোষ্ঠি হারামে ঘোষণা করা হয়। হিন্দুদের উসবসমূহ যেমনঃ
দেওয়ালি, দেশাহারা, রাঘী, পৃণাম, শিবরাত্রি প্রোত্সাহে পূর্ণ হিন্দুরীতি অনুযায়ী
পালন করার ব্যবস্থা করা হয়। রাজমহলে প্রতিদিন 'হাওয়ান' অনুষ্ঠিত হতে
থাকে। প্রতিদিন চার বার সূরোপাসনা করা হতো। সূর্যের এক হাজার নাম জপ
করা হতো। সূর্যের নাম উচ্চারিত হলে সঙ্গে সঙ্গে বলা হতো, 'তার শক্তি
মহান'। কপালে তিলক লাগানো হতো। কোমর ও কাঁধে পৈতৃক বাঁধা হতো।
গুরু প্রতি সমান প্রদর্শন করা হয়। জনান্তর্বাদকে ব্রহ্মাকার করে নেয়া হয়
এবং ব্রাহ্মণদের নিকট থেকে তাদের অন্যান্য বহু আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে
শিক্ষা গ্রহণ করা হয়। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের সাথে এ ব্যবহার করা হয়।
আর ইসলামের ব্যাপারে বাদশাহ ও তাঁর দরবারীদের প্রতিটি কার্যই প্রমাণ
করছিল যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের মন বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। অন্যান্য
ধর্মাবলম্বীদের পক্ষ থেকে দরবারের মেজাজ অনুযায়ী দার্শনিক ও সুফিদের
ভাষায় ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে যে কথা পেশ করা হতো, তাকে আসমানি
ও হই মনে করা হতো এবং তার মোকাবিলায় ইসলামী শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করা
হতো। মুসলমান আলেমগণ যদি ইসলামের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলতেন
অথবা কোনো গোমরাহির বিরোধিতা করতেন, তাদেরকে 'ফকিহ' আখ্যা দান
করা হতো। তাদের বিশেষ পরিভাষায় এর অর্থ ছিল নিরূধ ব্যাক্তি এবং যে
ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত করার প্রয়োজন হয় না। ধর্মসমূহ সম্পর্কে অনুসন্ধান
করার জন্য চত্রিশ ব্যক্তির একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি অন্যতে
উদারতা ও ভক্তির সংগে বিভিন্ন ধর্মসমূহ অধ্যয়ন করে কিন্তু ইসলামের নাম
ঔষধেই তার প্রতি বিদ্রোপবাণ নিকেপ করা হতো; আর কোনো ইসলাম
সমর্থক এর জন্য দিতে চাইলে তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হতো। ইসলামের
সঙ্গে শুধু এ আচরণ করেই ক্ষমতা থাকা হয়নি বরং কার্যতঃ প্রকাশ্যে ও
ব্যাপকভাবে ইসলামী নিরদেশকীরী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়। সুদ, জুয়া ও
শরাবকে হালাল করা হয়। নওরোজ উৎসবে রাজ সভায় শরাব ব্যবহার
অপরিহার্য ছিল। এমন কি কাজি ও মুফতি পর্যস্ত শরাব পান করে ফেলতো।
দাঁড়ি চেঁচে ফেলার ফায়শন প্রবর্তন করা হয় এবং বৈধতার সম্পর্কে প্রমাণ পেশ
করা হয়। চাচাত ও মামাত বোনদের সঙ্গে বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।
পুরুষদের জন্য ১৬ বছর ও মেয়েদের জন্য ১৪ বছর বিয়ের বয়স নির্ধারিত
হয়। একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। রেশম ও স্বর্ণের ব্যবহার বৈধ গণ্য
করা হয়। সিংহ ও বাঢ়ের গোশত হালাল ঘোষণা করা হয় এবং ইসলামের
প্রতি জিন্দের বশবতী হয়ে শূকরকে শুধু পাকিন নয় বরং একটি অতি পবিত্র
প্রাণী বলে ঘোষণা করা হয়। এমন কি সকলে বিহ্বানা ছেড়ে সর্বপ্রথম শূকর
দর্শনকে বড়ই মোকাবলক মনে করা হতো। মৃত দেহকে কবরস্থ করার পরিবর্তে
পুড়িয়ে ফেলা বা পানিতে ভাসিয়ে দেয়াকে ভালো গণ্য করা হয়। আর যদি
কেউ এককালে কবরস্থ করতে চাইতো তাহলে পদচ্যুত কেবলার দিকে স্থান
করার জন্য তাকে পরামর্শ দেয়া হতো। আকবর নিজেও ইসলামের প্রতি
জিন্দের বশীভূত হয়ে পদচ্যুত কেবলার দিকে রেখে শয়ন করতন। সরকারের
শিক্ষার্থীতিতে পূর্ণ ইসলাম বিরোধী ছিলো। অরবী ভাষা শিক্ষা এবং ফিকহ ও
হাদিস অধ্যায়নকে অপরূপ করা হতো। যারা এসব বিদ্যা অর্জন করতো
তাদেরকে হেয়রেতিপন্নু করা হতো। দীনি এলমের পরিবর্তে দর্শন, তরকাশক্ত,
অংক, ইতিহাস ও এ ধরনের অন্যান্য বিদ্যাসমূহ সরকারী সাহায্য লাভ করে।
ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন

তাহার মধ্যে হিন্দী রীতি সৃষ্টি করার দিকে বিশেষ আগ্রহ ছিল। আরোই শাদাবলীকে তাহার চৌহাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করার চেষ্টা ছিল। এ অবস্থায় দীনি মদ্রাসাগুলো ছাড় শুন্য হয়ে যেতে থাকে এবং অধিকাংশ আলেম দেশ ত্যাগ করতে শুরু করে।

এ ছিল সরকারের অবস্থা। অন্যদিকে জনগণের অবস্থাও এর চাইতে মোটেই উন্নত ছিল না। বিদেশীরক্ষা ইরান ও খোরাসানের নৈতিক ও আক্রান্ত বাণিজ্য সঙ্গে করে এনেছিল। আর যারা ভারতে মুসলমান হয়েছিল, তাদের ইসলামী শিক্ষা ও অনুশীলনের কোণ বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। তাই তারা পূর্বাটন জাহেলিয়াতের বহু রীতি-পদ্ধতি তাদের চিহ্ন ও বাণিজ্য জীবনে ধারণ করেছিল। এ দু’ ধরনের মুসলমানের সমিলিত প্রচেষ্টায় এক অদৃশ্য মিশ্রণ তৈরি হয়েছিল। তার নাম দেয়া হয়েছিল, ‘ইসলামী তমুদকুনি’। তাতে শেষের সংমিশ্রণ ছিল, বংশ ও শ্রেণী ভেদ ছিল, কাল্পনিক ও পৌরাণিক চিন্তা-ধারণা ছিল এবং নব আবিষ্কৃত রসম-রেওয়াজ সহিত একটি নতুন শরীরত ছিল।

দুনিয়া পূজারী গুলাম ও মাশারেখগণ কেবল এ অদৃশ্য মিশ্রণটির সাথে সহযোগিতা করেই ক্ষুদ্র থাকেনি বরং তারা এই নতুন ‘মত’-এর পৌরহিত্য ও শাসন করেছিল। জনসাধারণ তাদেরকে জনরাজ্যে পেশ করতো আর তারা জনগণের মহাবীর বিরুদ্ধে তোহা দান করতো।

পীর সাহেবনারের মধ্যে আর একটি রোগ ও বিস্তার লাগ করেছিল। নোয়া প্লেটোবাদ, বৈরাগ্যবাদ (Stoicism), মনুবাদ ও বেদাত্মবাদের সংমিশ্রণে এক অদৃশ্য ধরনের দর্শন ভিত্তিক তাসাউফ জন্মাই করে। ইসলামী আধুনিক-বিশ্বাস ও নৈতিক ব্যবহার তাকে স্থান দেয়া হয়। তরিকত হয়কে ইসলামী শরীরত থেকে পৃথক এবং তার থেকে মুখার্জনকীর্তি গণ্য করা হয়। বাতেরের এলাকার জন্য থেকে পৃথক করে নেয়া হয়। এ এলাকার আইনে হালাল ও হারামের সীমানা বিলুপ্ত ইসলামী বিধি-নিষেধসমূহ কার্যত বাতিল এবং সমস্ত ক্ষমতা ইন্দ্রিয় লিখার হাতে কেন্দ্রীত হয়। ইচ্ছা মতো কোনো হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করা ছিল এ আইনের বৈশিষ্ট্য। এ সাধারণ পীরদের থেকে যার অবস্থা ভালো ছিল বিশেষ ও কমরেশী ঐ দর্শন ভিত্তিক তাসাউফ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। বিশেষ করে সর্বশ্রেষ্ঠবাদের ভাস্ত ধারণা সমস্ত কর্মক্ষমতা হৃদয় করে নেয়।

এহেন পরিস্থিতিতে আক্রমের শাসনামলের প্রথম দিকে শায়খ আহমদ সরহিদী জন্মাই করেন। ১৬ সেকালের সর্বোচ্চ উন্নত চরিত্রের লোকদের

১৬. জন্ম ১৫৬৩ হিজরী (১৫৬৩ খ্রিষ্টাব্দ) এবং মৃত্যু ১৫৬৩ হিজরী (১৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)
নিকট তিনি শিক্ষালাভ করেন। তাঁরা নিজেদের চক্ষুপার্শ্বের বিকৃতির মোকাবিলা করার ক্ষমতা না। রাখলেও কমপক্ষে নিজেদের ঈমান ও আমলকে সংরক্ষিত রেখেছিলেন এবং যথাসাধ্য অনুরাধ নাশনও করতেন। বিশেষ করে হররত শায়খ আহমদ সরহাদের প্রবন্ধ লাভান হন হরত বাকিবিলাহার সাহায্যে। হরত বাকিবিলাহ সে যুগের অন্যতম উন্মুক্ত চরিত্রের সম্পন্ন বৃহৎ ছিলেন। কিন্তু হরত শায়খের নিজের মোকাবিলাতে ছিল অপরিসীম। হরত বাকিবিলাহার সাথে যখন তাঁর প্রথম সংযোগ স্থাপিত হয় তখনই হরত বাকিবিলাহ তাঁর কমপক্ষে নিজের এক বন্ধুকে নিম্নলিখিত পত্র লেখেন:

“সন্ত্রান্ত সরহাদ থেকে শায়খ আহমদ নামে এক বক্তা এসেছে। বিপুল দ্বীপে আঁনের অধিকার। কর্মক্ষমতাও ব্যাপক। ফকিরদের সাথে কয়েকদিন তাঁর আলোচনা হয়েছে। এ সময়ে তার যে অবস্থা প্রত্যাখ্য করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আশা করা যায় যে, রাজনীতিকালে এ ব্যক্তি একটি আলোকবর্তিকার আকারে সমগ্র দুনিয়াকে উজ্জ্বল করবে।”

এ ভবিষ্যদ্বাণী রাজনীতিকালে সত্যে প্রমাণিত হয়। ভারতের বিভিন্ন এলাকায় তৎকালে বহু সত্যসুরারাও ওলামা ও সুফি বর্তমান ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে তিনি একাই সমকালীন ফিতনাসমূহের মোকাবিলাও ইসলামী শরীয়তকে সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হন। রাজশাহীর মোকাবিলায় তিনি একাই ইসলামী পুনরুজ্জীবনের সংগঠন পরিচালনা করেন। এ নিঃসাহায় ও নিঃসরণ ফকিরটি একাই প্রকাশের অধিকারী ও খোলাখুলিভাবে সরকারী সাহায্য পুষ্ট সুরক্ষার মোকাবিলা করেন এবং সরকারী রোষানলে প্ল্যাট শরীয়তের পক্ষ সমর্থন করেন। সরকার তাকে দমন করার জন্য যাবতীয় অন্ত প্রয়োগ করে, এমনকি তাকে স্বাস্থ্যের দরে প্রেরণ করে। কিন্তু অবশেষে তিনি ফিতনার গতি পরিবর্তন করতে সক্ষম হন। ‘সমানির সিজিদা’ না করার কারণে জাহাঁগীর তাকে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করেন। কিন্তু অবশেষে জাহাঁগীর নিজেই তাঁর মত হয়ে পড়েন এবং নিজ পুত্র খুররমকে—হিন্দু রাজনীতিকালে শাহজাহানের উপাধি লাভ করে—তখন হয় তার ছাত্রের দলে ভর্তি করে দেন। ফলে ইসলামের ব্যাপারে সরকারের বিরোধ ও বিদ্যমান সমাজের রূপ লাভ করে। ‘দীনে ইসলামি আকবর শাহ’ তাঁর দরবারী শরীয়ত প্রণেতাদের সৃষ্ট যাবতীয় বিদ্যমান বিদ্যমান হয়। সরকার যদিও রাজনীতিতে ছিল তবুও এ ক্ষেত্রে কমপক্ষে এতটুকু পরিবর্তন সাধিত হয় যে, ইসলামী শিক্ষা ও শরীয়তের বিধানাবলীর ব্যাপারে তাঁর মনোভাব কফেরগুলো হবার পরিবর্তে...
হয় ভক্তসুলভ। শায়খের মৃত্যুর তিন-চার বছর পর আলমগীরের জন্ম হয়।
সত্তরকার যুগের পরিবর্তে সংস্কারমূলক কার্যালয়ের প্রতিনিধি তেমুর বংশে এ শাহজাদাদি এমন তত্ত্বাত্মক ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হন, যার ফলে আকবরের ন্যায় শরীয়ত ধর্মীয় কার্যের প্রপুরুশ শরীয়তের খাদেশে পরিণত হন।

শায়খের কার্যালয় শ্রু এতুমাকে মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যে, ভারতের রাষ্ট্র
কর্তৃত্বকে পূর্ণতা কুফরীর দিকে চলে যাবার পথে তিনি প্রতিবেশকতা সৃষ্টি
করেন এবং আজ থেকে তিন-চারশো বছর আগে এখানে ইসলামের নাম-
নিশানা মিটিয়ে দেবার জন্যে যে বিরাট ফিরানার সম্ভাবনা প্রবাহিত হয়, তার
গতিধারাও পরিবর্তিত করে দেন। বরং এছাড়া আরো দুটো বিরাট কার্যও তিনি
সম্পাদন করেন। এক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক খ্যাতিতে কারণে তাসাউফের
নির্মল ঝরণাধারায় মেসব ময়লা-আবর্জনা মিশ্রিত হয়ে যায়, তা থেকে তাকে
পরিচ্ছন্নি ও পরিত্যক্ত করে ইসলামের নির্ভরজাত ও আসল তাসাউফ পেশ
করেন। দুই, তৎকালে জনসাধারণের মধ্যে মেসব জাহালি রসম-রেওয়াজ বিষার লাভ
করে তিনি তার কঠোর বিরোধিতা করেন এবং আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ও সংস্কার
সাহনের মাধ্যমে শরীয়ত অনুসারিতার এক শাক্তশালী আন্দোলন পরিচালনা
করেন। এ আন্দোলনের হাজার হাজার সুদক্ষ কর্মী কেবল ভারতের বিভিন্ন
এলাকায়ই নয় বরং মধ্য এশিয়াও পৌছে যায় এবং সেখানকার জনগণের
চরিত্র ও আকিদার সংস্কার সাহসের প্রচেষ্টা চালায়। এ কার্যালয়ের কারণেই
হয়ত শায়খ সরহ্বন্দি মুসলিম মুজাদরীদের মধ্যে স্থানান্তর করেছেন।
হযরত মুজাদিদে আলাফি সানির (র) ইস্কোলের পর এবং বাদশাহ আলমগীরের ইস্কোলের চার বছর পূর্বে দিল্লীর শহরতলীতে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। ১৭ এদিকে তাঁর জামানা ও পরিবেশ এবং অন্য দিকে তাঁর কার্যকারিকে সমানসামনি রেখে বিচার করতে অহসর হলে মানুষ হতভাগ হয়ে যায় যে, সে যুগের এরনে পৃথিবীর দৃষ্টি, চিত্তা ও রুদ্ধিবৃদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য কেমন করে সম্পর্ক হলো। ফররুখ সায়র, মুহম্মদ শাহ রঘীলা ও শাহ আলমের ভারতবর্থে কে না জানে। সেই অস্কার যুগে শিক্ষালাভ করে এমন একজন মুক্ত বিচারবুদ্ধিমণ্ডল চিত্তানায়ক ও তার কার্যকারিকে জনসম্মত আবির্ভূত হন যিনি জামানা ও পরিবেশের সকল বন্ধন মুক্ত হয়ে চিত্তা করেন, আছল্ল ও দৃষ্টি জান ও রহস্যময় জ্ঞাত বাঁধা বিদ্যমনের বন্ধন ছিল করে প্রতিভাটি জীবন সমস্যার ওপর অনুভূতিতে ও মুক্তাত্তিকের দৃষ্টি নিকেট করেন এবং এমন সাধারণ সৃষ্টি করে যান—যার ভাবা, বর্ণনামতি, চিত্তা, আদর্শ, গবেষণালব্ধ বিয়ো ও সিদ্ধাস্তের ওপর সম্প্রদায়ের কেমন ছাপ পড়েনি।

এমনকি তাঁর রচনা পাঠ করার সময় উঠে এতটুকু সংজ্ঞায়ী উদয় হয় না যে, এজুলা এমন এক স্থানে বসে রচনা করা হয়েছে যে হোক দৃষ্টিকে বিলাসিতা, ইন্দরিয়পূজা, হত্যা, লুট্টরাজ, যুক্ত, নিন্দা, অশ্রুতি ও বিশ্বকলার অধু রাজত্ব চলছিল।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মনুষ ইতিহাসের এমন এক বিষয় প্রাপ্ত নেতৃপ্তের অন্তর্বুক্ত যারা হামেশা মতবাদের বিভাজনীয় মুক্ত করে চিত্তা ও গবেষণার একটি পরিচ্ছন্ন ও সরল রাজ্যের চরিত্র এর। সব যেমন এমন এক একটি সমাধান কর্ম নস্তা তাঁর করে যার ফলে অবিভাজ্য ও অস্তিত্বের রহস্য সাধন এবং নায়ে, সত্য ও সুন্দরের পুনর্গুণের উদেশ্যে একটি আন্দোলন জন্মগ্রহণ করে। এ ধরনের নেতা কেদাচিৎ নিজের চিত্তা ও মতাত্ত্বিক অদৃষ্ট্র্য নিজেই একটি আন্দোলন গঠে তোলেন এবং বিকৃত পৃথিবীর ভ্রমচুরের হয়ে একটি নতুন পৃথিবী গঠন করার জন্য কর্মক্ষেত্রে পাপিয়ে পড়েন। ইতিহাসের এর দৃষ্টিতে বিরল। এ ধরনের নেতৃবৃদ্ধের আসল কাজ হয় এই যে, তাঁরা সমালোচনার ছুরি চালিয়ে শত শত বছরের বিভাজ্যতায় ছিল ভিন্ন করেন, রুদ্ধি ও চিন্তাজগত নতুন আলোক শিখার উল্লেখ ঘটান, জীবনের বিকৃত অঘট শক্তিশালী কাঠমোটি

১৭. জন্ম ১১১৪ হিজরী (১৭০৩ খ্রীঃ) ও মৃত্যু ১১৭৬ হিজরী (১৭৬৩ খ্রীঃ)
ভেঙে তার ভগববেশ থেকে আসল ও দীর্ঘস্থায়ী সত্যকে পৃথক করে দুনিয়ার সম্পূর্ণতা উপস্থাপিত করেন। একাধিক অগ্রভাব ব্যাপক ও বিরাট। তাই এ কাহিনি সমাজদর্শনকারী আবার নিজেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরন করে কার্যতঃ জাতি গঠনের কাজেও আত্মনিয়োগ করবেন এ অবসর তিনি কদাচিত লাভ করতে পারেন। যদিও শাহ ওয়ালিউদ্দিন তাঁর রচিত ‘তাফসীমাত ইলাহি’ প্রথমে একস্থানে এ সম্পর্কে কিছুটা উল্লেখ দিয়েছেন যে, হান-কালের উপযোগী হলে তিনি যুদ্ধ করেও কার্যতঃ সংশোধন করার যোগ্যতাও রাখতেন। ১৮ কিছু আসলে এ জাতীয় কোনো কাজ তিনি করেননি। সমালোচনা ও চিন্তার পুনর্গঠনের ব্যাপারেই তাঁর সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত ছিল। এ বিরাট কাজ থেকে তিনি এতদূরের অবসর পাননি। নিজের নির্দেশগুলি পরীক্ষায় সংশোধনের জন্যে সামান্যতম পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফরসতও তাঁর ছিল না। পরবর্তী পর্যায়ে আমারা একথা আলোচনা করবো যে, তিনি যে পথ পরিক্ষা করেছিলেন, তার ভিত্তিতে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাবার জন্যে অন্য একদল লোকের প্রয়োজন ছিল এবং মাত্র অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই তারা তাঁর নিজের শিক্ষা ও অনুশীলনগুলির মধ্য থেকে শক্তি ও পরিপূর্ণ লাভ করে কর্মক্ষেত্রে অবতরন করেন।

শাহ ওয়ালিউদ্দিন (র) এর সংক্ষেপে মূল কার্যালীকে আমারা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি। এক, সমালোচনা ও সংশোধনমূলক। দুই, গঠনমূলক। এ উভয় কার্যালীকে আমি পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করবো।

সমালোচনা ও সংশোধন

শাহ ওয়ালিউদ্দিন সমালোচনার দৃষ্টি নিয়ে সমগ্র ইসলামী ইতিহাস পর্যালোচনা করেন। আমার জানা মতে, শাহ ওয়ালিউদ্দিন প্রথম বক্তা যার দৃষ্টি ইসলামের ইতিহাস ও মুসলমানের সৃষ্টি ইতিহাসের মৌল পার্থক্য পর্যালোচনা করেছে, যিনি ইসলামী ইতিহাসের দৃষ্টি থেকে মুসলিম ইতিহাসের সমালোচনা

১৮. তাফসীরমাত, প্রথম খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা ৪
ও পর্যালোচনা করেন। এভাবে তিনি সর্বপ্রথম একথা অবগত হবার চেষ্টা করেন যে, বিভিন্ন শতকে ইসলাম হ্রাসকারী জাতিসমূহের মধ্যে আসলে ইসলাম কি অবস্থায় থাকে। এটি বহু নাম্বার বিষয়বস্তু। আগেও কিছু লোক এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত শিকার হন এবং আজও হয়েছেন। শাহ ওয়ালিউদ্দিন রাহর পর এমন একজন লোকের অবিভাজ্য ঘটনি যাকে মনে মুসলিম ইতিহাস ছাড়া আসল ইসলামী ইতিহাসের কোনো পৃথক ধর্মের ছিল। শাহ ওয়ালিউদ্দিন রাহর রচনার বিভিন্ন অংশে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে। বিশেষ করে ‘ইয়ালাতুল ফিফা’ গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১২২ পৃষ্ঠা থেকে ১৫৮ পৃষ্ঠাঃ ১৯ পর্যন্ত তিনি ধারাবাহিকভাবে মুসলিম ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে প্রভূত যুগের বিশেষত্ব এবং প্রভূত যুগের ফিতনা বিবৃত প্রসংগে এ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ইংগিতবহ নবী করিম (س)'-এর ভবিষ্যত বাসিন্দাও উল্লেখ করেন। এ আলোচনায় মোটামুটি মুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাস, শিক্ষা, চরিত্র, তমুদন ও রাজনীতিতে সংমিশ্রিত সকল প্রকার জাহান্নামের দিকে অগ্রগণ্য নির্দেশ করা হল।

অতঃপর গল্পের স্থের মধ্যে অনুসারণ চালিয়ে তিনি একথা জানার চেষ্টা করেন যে, এর মধ্যে মৌলিক গল্প কোন্সুলো—যেখান থেকে সকল গল্পের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। অবশেষে তিনি দুটি বিষয়ের প্রতি অগ্রগণ্য নির্দেশ করেন। একটি হলো খেলাফত থেকে রাজতন্ত্রের দিকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের গতি পরিবর্তন এবং অন্যটি হলো ইজতিহাদের প্রাণ শক্তির মূত্র ও মন-মস্তিষ্কের ওপর অঙ্গুল অনুসারিত বিপুল আধিপত্য।

প্রথম গল্পটি সম্পর্কে তিনি ‘ইয়ালাতুল ফিফা’ বিষয়বস্তু আলোচনা করেন। খেলাফত ও রাজতন্ত্রের নীতিগত ও পারিভাষিক পার্থক্যকে যেমন সুস্পষ্টতাকে তিনি বর্ণনা করেন এবং হাদিসের সাহায্যে যেভাবে তার ব্যাখ্যা করেন তার পূর্বেকার লেখকদের রচনায় তার দৃষ্টান্ত বিরল। অনুপস্থিত এ বিষয়ের ফলাফলকে তিনি যেমন পরিস্ফুটন করেন, পূর্ববর্তীদের রচনায় তেমনটি দেখা যায় না। এক স্থানে তিনি বলেনঃ

‘ইসলামের আরোমাসসহক প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে বিভিন্ন গল্পের দেখা দিয়েছে। ---- হযরত উব্বাসান (রা)-এর পর কোনো শাসক হুসৈন কায়ম করেননি বরং নিজের প্রতিনিধি প্রেরণ করের তার যায়। অর্থ হুসৈন কায়ম করা খেলাফতের অপরিহার্য বিষয়সমূহের অন্তর্গত। সিংহাসনে আরোহণ করা, শাহী তাজ পরিধান করা এবং পূর্ববর্তী বাদশাহগণের স্থানে উপরের পঞ্চত্রয়”

১৯. ১২৮৬ হিজরীতে বেশির হতে প্রকাশিত ‘ইয়ালাতুল ফিফা’ এর হতে আমি এ আলোচনা পেশ করেছি।

www.icsbook.info
রায়ের অধিকার ছিল না। কিন্তু এ বিপ্লবের পর উপদেশ ও ফতোয়া উভয়ই এ তাত্ত্বিক মূল্য হয় বরং পরবর্তীকালে ফতোয়া দানের জন্যে এমনকি সত্ত্বারকের দলের পরামর্শেরও কোন শর্ত ছিল না।

অন্তপর বলেন:

"এদের সরকার অগ্নি উপালকদের সরকারের নায়। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, এরা নাম্বার পড়ে এবং মুখে কালো শাহী উচ্চারণ করে। এই পরিবর্তনের মধ্যে আমাদের জন্য। জানি না পরবর্তীকালে আমাদের তায়ালা আরো বা কি দেখাতে চান।"  }

দ্বিতীয় গল্পটি সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ইয়ালাতুল খিফা, হজ্জাতুর্রাহিম হল বালিগাহ, বুদবর বাজিগাহ, তফিহীম, মদীনা, মদীনাওয়া এবং তার অন্যান্য প্রায় সকল গ্রন্থের যুক্তি প্রকাশ করেন।

ইয়ালায় বলেন:

"সিরিয়ার শাসকদের (উমাইয়া সরকার) পতনকাল পর্যন্ত, কেউ নিজেকে হানাফী বা শাফেরী বলে দাবী করতো না। বরং সবাই নিজেদের ইমাম ও শিক্ষকগণের পদ্ধতিতে শরীয়তের প্রমাণ সংগঠ করতেন। ইরাকী শাসকদের (আবাসীয় সরকার) জামানায় প্রত্যেককেই নিজের জন্যে একটি নাম নির্দিষ্ট করে নেয়। তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, নিজেদের মধ্যবর্তী বড় বড় নেতাদের সুপ্রস্তু সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত কুরআন ও সুন্নাতের দলের ভিত্তিতে তারা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো না। এভাবে কুরআন ও সুন্নাতের ব্যাখ্যার ফলে অনিবার্য মোটবিবরাধ সৃষ্টি হতো, সেগুলো স্বাভাবিক বিনিয়োগের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

20. ইয়ালাতুল খিফা, প্রথম খণ্ড, ১২৩-১২৪ পৃষ্ঠা।
21. ইয়ালাতুল খিফা, প্রথম খণ্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা।
22. ইয়ালাতুল খিফা, প্রথম খণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা।
23. ইয়ালাতুল খিফা, প্রথম খণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা।
অতপর আরব শাসকদের পতনের পর অর্থাৎ তুর্কী শাসনামলে লোকেরা বিভিন্ন দেশে বিকিড় হয়ে পড়ে। তারা প্রত্যেকেই নিজের ফিকাহ ভিত্তিক ময়হার থেকে যাকিছ্দ শ্রম করতে সক্ষম হয়, সেটুকুকেই আসল দীনে পরিণত করে। পূর্বে যে বস্তু কুরআন ও হাদিসের সূত্র উদ্ধত ময়হার ছিল, এখন তা স্থায়ী সুনামতে পরিণত হয়। এখন তাদের বিদ্যা ও জ্ঞান নির্ভর করতে থাকে কুরআন ও সুনাম থেকে সংগৃহীত বিধানকালীন সংগ্রহ এবং কুরআন ও সুনাম থেকে সংগৃহীত খুটিনাটি বিষয়ের ভিত্তিতে খুটিনাটি বিষয় সংগ্রহ করার ওপর ।

মুসাফফায় লেখেনঃ

“আমাদের জন্মানার নির্বাহ ব্যক্তিরা ইজতিহাদের নামে ক্ষেপ ওঠে। এদের নাকে উত্তরের মতে দংড়ি বাঁধা আছে। এরা জানে না, কোনু দিকে যাচ্ছে। এদের ব্যাপারই তিনি রকমের। ঐসব ব্যাপার বুঝার যোগ্যতাও এ বোচারদের নেই।”

হজতুরুল্লাহ বালোগার সভাম অধ্যায়ে ও ‘ইনসাবে’ শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) এ রোগের পূর্ব ইতিহাস বিবৃত করেন এবং এর দ্বারা সৃষ্ট যাবতীয় ক্রটির প্রতি অগ্রণী নির্দেশ করেন।

এমনিহাসিক সমালোচনার পর শাহ ওয়ালিউল্লাহ সমকালীন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন এবং তার উল্লেখ করে প্রত্যেকের দোষ-ক্রটি বিবৃত করেন। তাফহিরাতের একস্থানে লেখেনঃ

“এ ওসিয়তকারী (অর্থাৎ শাহ ওয়ালিউল্লাহ) এমন এক যুগে জন্মগ্রহণ করেছে যখন মানুষ তিনি বিষয়কে মিশ্রিত করে ফেলেছে।

১. কৃত্রিম : ঐক বিদ্যাসমূহের মিশ্রণের ফলে এর উদ্ভব হয়েছে। লোকেরা কালাম শাসনের বিতর্কে মশগুল হয়ে গেছে। এমন কি আকিদা-বিশ্বাসের প্রশ্ন এমন কোনো আলোচনা হয় না যার মধ্যে অনর্থী যুক্তি-ভিত্তিক বিতর্ক থাকে।

২. অনুশুর্তির আনুগত্য : সুফিদের জনপ্রিয়তা ও তাদের ভক্তিদলে শামিল হবার কারণে এর উদ্ভব হয়েছে। প্রচ্ছ ও পাল্লাতের সমল এলাকায় এ জনিতা আক্ষর হয়ে আছে। এমন কি এই সুফিদের কথা ও কর্ম সাধারণ মানুষের মনের ওপর কুরআন ও সুনাম তথা সকল জিনিসের চাইতে বেশি

24. ইয়ালাতুল খিফ, প্রথমখা, ১৫৭ পৃষ্ঠা।
25. মুসাফফ, প্রথমখা, ১১ পৃষ্ঠা।

www.icsbook.info
আধিপত্যশালী। তাদের তত্ত্বকথা ও ইংরিজিতসমূহ এভাবে প্রতিষ্ঠালাত করেছে যে, যে ব্যক্তি সেব তত্ত্বকথা ও ইংরিজিতসমূহ অহিরীয় করে অথবা এগুলো কেন্দ্র না দেয়, সে জনশ্রয়তা অভিন্ন করতে পারে না এবং সংলাপকের মধ্যে গণ্য হয় না। মিশরের ওপর দাঁড়িয়ে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে সুফিদের ইশারা ইংরিজি বর্জিত বক্তা করে। মাদ্রাসায় অধ্যাপনারত এমন কোনো আলমেও নেই, যে তাদের কথায় বিশ্বাস ও দূষ প্রত্যয় পোষণ না করে। অন্যথায় তারা নির্বোধ বিবেচিত হয়। আবার আমির-ওমরাহের এমন কোনো মজলিস নেই যেখানে মাধুর্য, সুখ রুচিরোধ ও শিক্ষকারিতার জন্যে সুফিদের কবিতা ও তত্ত্বকথা ব্যাপকভাবে ব্যবহার না করা হতো।

৩. খোদার প্রতি আনুগত্য ৪ মুসলিম মিষ্টান্তের অন্তর্ভুক্ত থাকার কারণে এটি মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য ছিল।

"আবার এ যুগের একটি অন্যতম রোগ হলো এই যে, প্রত্যেকে নিজের মত অনুযায়ী চলছে। এরা লাগামহীনভাবে চলছে, কোনো নিয়ম নেই, কুরআন ও হাদিসের কোনো আলংকারিক বিষয়ে এসে স্থল হয়ে যায় না এবং এদের জানালীর বহিষ্কৃত কোনো বিষয়ে অন্যচরণ করা থেকেও বিষ্কৃত হয় না। প্রত্যেকে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে খোদা ও রসূলের নির্দেশনালীর অর্থ ও তাত্ত্বিক অনুসরণ করছে এবং এ ব্যাপারে নিজে যা বুঝতে সক্ষম হয়েছে তার ভিত্তিতে অন্যের সংগে বিতর্ক ও কুতর্কে লিপ্ত হচ্ছে। এছাড়াও আর একটি রোগ দেখা দিয়েছে। হায়লী ও শাফতী প্রভূতি গ্রন্থিত ফিকাহ মধ্যে তীব্র বিরোধ পরিদৃশ্য হচ্ছে। প্রত্যেকে নিজের পদ্ধতিকে একমাত্র সত্য মনে করছে এবং অন্যের বিচ্ছেদ আদর্শ উদাহরন করছে। প্রত্যেক মহাবেদ তুলিনাটি ও পুঁতামুপুঁত বর্ণনার আধিক্য, আর এই সবিতার বর্ণনার ভিত্তি সত্য প্রহর্ষ্ব হয়ে গেছে।"

এই বইয়ের আর এক স্থানে লেখেনঃ

"কোনো নায়সংগত অধিকার ছাড়াই যেখানে পীরজাদা বাপ-দাদার গদীনশীল হয়েছে, তাদেরকে আমি বলি ৪ তোমরা কেন এইসব পৃথক পৃথক দল গঠন করে রেখেছো । তোমাদের প্রত্যেকেই নিজের নিজের পথে চলছো কেন । আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সালাল্হু আলাইহি ওয়া সালামের ওপর যে পথটি অতিমুখী করেছিলেন সেটি পরিত্যাগ করেছে কেন । তোমাদের প্রত্যেকে ইমামের পরিণত হয়েছে। মানুষকে নিজেদের দিকে আহ্মান জানাচ্ছে। নিজেদেরকে হেদায়তকারী ও হেদায়তদানকারী"
মনে করছে, অথচ সে নিজে পথহরি এবং মানুষকে পথহরি করছে। পার্থিব স্বার্থের খাতিরে যারা মানুষের নিকট থেকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে তাদের প্রতি আমরা বিদ্বঞ্চিতের সত্ত্বা নই। আর যারা দুঃখিত স্বার্থের খাতিরে জান অর্জন করে অথবা মানুষকে নিজেদের দিকে আহ্বান করে তাদের দ্বারা নিজেদের পার্থিব কামনা চরিতার্থ করে, তাদের প্রতিও আমরা সত্ত্বা নই। তারা সবাই দম্য, দাঙ্গাল, মিথ্যক, প্রবলক ও প্রবঞ্চিত। ----

“নিজেদেরকে উলামা আখ্যাদানকারী তালেব ইলমেদেরকেও আমি বলি ও নির্বোধের দল! তোমরা শ্রীকরের বিদ্যা, ব্যক্তিগত ও অন্যান্য শাখার গোলক ধাঁধায় আটকে পড়েছে আর মনে করছে যে, বিদ্যা-বুদ্ধি এগুলোর নাম। অথচ বিদ্যা খোদার কিংবদন্তীর আর তুমি স্বপ্নে অথবা তার রসূলের মাধ্যমে অপারেন্টিস সন্নাতের মধ্যে নিহত। ---- তোমরা পূর্ববর্তী ফকিহগণের খুনাটিকে ও বিস্তারিত বর্ণনাবলীর মধ্যে ডুবে গিয়েছে। তোমরা কি জানো না যে, আল্লাহ ও তার রসূল যা বলেছেন, সেটিই একমাত্র হুকুম? তোমাদের অধিকাংশ লোকের অবস্থা হলো যে, নবীর কোনো হাদীস যখন তাদের নিকট পৌরুষ, তখন তারা তার ওপর আমল করে না। তারা বলে: আমরা তো অমুক মহাবের ওপর আমল করি, হাদীসের ওপর নয়। অতএব তারা বাহানা পেশ করে যে, জনাব! হাদীস বুদ্ধি ও সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বিশেষজ্ঞ ও পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী লোকদের কাজ, তাছাড়া এ হাদীসটি পূর্ববর্তী ইমামগণের দৃষ্টিসমূহে বাইতে ছিল না নিচ্ছই। তাহলে তাদের এ হাদীসটি পরিত্যাগ করার পেছনে নিচ্ছই কোনো কারণ থাকবে। জেনে রেখ। এটি আপনী দীরের পথ নয়। যদি তোমরা তোমাদের নবী (স)-এর প্রতি ঈমান এনে থাকো, তাহলে কোনো মহাবের বিপক্ষে বা স্পষ্টত যাই হোক না কেন, তাঁর ইতেরা করো। ----

“আমি ওয়াজ-নসিহতকারী, আবেদ ও খানকাহার্সিদেরকে বলি ও হে তাকওয়া ও পরহেজগারীর দাবিদারগণ! তোমরা যত্নে ছুটে বেড়াছে এবং ভালো-মন্দ সর্বকিছু হস্তগত করছে। তোমরা মানুষকে মিথ্যা ও মন্দা বিষয়ের দিকে আহ্বান করছে। তোমরা খোদার বাদাদের জীবনের পরিধি সংকীর্ণ করে দিয়েছে। অথচ তোমরা সংকীর্ণতা নয়, ব্যাপকতার জন্য আদিত্য ছিলে। তোমরা অপর্কুতিসূচী খোদা প্রেমিকএর কথাকে নিরভরশীল বলে মেনে নিয়েছে। অথচ এসব বিক্ষিপ্ত করার নয়, বেঠে তুলে রাখবার জিনিস ----।"
"আমি আমির-ওমরাহকে বলি তোমাদের কি খোদার ভয় নেই? তোমরা নিঃসন্দেহ আল্লাহ-আয়াতের সন্থানে লিখ হয় সাধারণ মানুষকে পরিবর্ত সংগ্রামে লিখ হবার জন্য ব্যাপক সুখোগ দান করছো। প্রাক্তন শরাব পান করা হচ্ছে অথচ তোমরা বাধা দিচ্ছে না। প্রাক্তন ব্যভিচার, শরাব পান ও জ্যোৎস্লায় মেহলা আড় আছে অথচ তোমরা এইগুলো বন্ধ করার কোনো ব্যবস্থা করছো না। এই বিরাট দেশে সুদীর্ঘকাল থেকে শরীয়তের আইন অনুযায়ী কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি। তোমরা যাকে দুর্লভ মনে কর, তাকে খেয়ে ফেলো আর যাকে শক্তিশালী মনে কর, তাকে ছেড়ে দাও। নানা রকম খাদ্যের সাধন গ্রহণ, তীর্থের মান-অভিমান এবং গৃহ ও বন্ধনের বিলাসিতার মধ্যে তোমরা ভুলে গিয়েছো। একবার খোদার কথা চিন্তা করো না ----।"

"আমি সৈন্যদেরকে বলি: আল্লাহ তোমাদেরকে জিহাদ করার জন্যে, হকের কালামে বুলন্ড করার জন্যে এবং শেরক ও মুশরিকদের শক্তি নাশ করার জন্যে সৈন্যের পরিণত করেছিলেন। এ কর্তব্য উপভোগ করে তোমরা ঘোড়াওয়ালী অবস্থায় করাকেই নিজেদের পেশায় পরিণত করেছে। বর্তমানে জিহাদের নিয়ম ও উদ্দেশ্যের সংগে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থের উপরের জন্যে তোমরা সেবাবধিনীতে চাহিদ নিয়েছে। তোমরা ভাঙ্গ ও শরাব পান করো, দাড়ি মুক্ত করো ও গৌরব লাও করো, মানুষের ওপর যুদ্ধ নির্দেশন চালাও। তোমাদের মধ্যে হালাল-হারাম রূপের পার্থক্যের ঘুচে পেছো। খোদার কথা একদিন তোমাদেরকে এ দুর্দিন ছেড়ে চলে যেতে হবে, তারপর তোমরা কি কাজ করে এসেছো যে সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদেরকে অবগত করবেন ----।"

"আমি শ্রমজীবি ও সাধারণ মানুষকে বলি: বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী তোমাদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। নিজের প্রতিপালকের বদন্ধী থেকে তোমরা গাফিল হয়ে গিয়েছে এবং খোদার সাথে সেক্ষে বিলুপ্ত হয়েছে। তোমরা গায়রলাহর জন্যে করবানী করে এবং মাদর সাহেব ও সালার সাহেবের সাথে গিয়ে হজ সম্পাদন করো। এগুলো তোমাদের নিকৃষ্টতম কাজ। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির অবস্থা কিছুটা সন্ত্রাস হয়, এমন নিজের খানা-পিনা ও গোপাল-পরিচয়ের ওপর এতেকবানী খরচ করে যে, তার আয় তার জন্যে যথেষ্ট হয় না। তখন পরিবার পরিষেবার অধিকার গ্রহণ করে অথবা শরাব পান ও বারবনিতাদের মধ্যে নিজে ইহকাল ও পরকাল উভয়টাই নষ্ট করে ----।"
"অতপর মুসলিমানদের দল-উপদলকে সমাজগতভাবে সংঘর্ষ করে বলি কে বলি আদম! তোমরা নিজেদের চরিত্র নাশ করছো। তোমরা সংকীর্ণতায় আচরন হয়ে গেছে। শয়তান তোমাদের সংঘর্ষকে পরিণত হয়েছে। তোমাদের পূর্বত্তর নারীদেরকে নাশিত ও পদাধিকার করে রেখেছে। হালাল তোমাদের মুখে বিশ্বাদ ঠেকেছে ---।"

"হে বলি আদম! তোমরা এমনসব নিরুপত রসম-রেওয়াজের অনুসারী হয়েছে, যার ফলে দীন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যেমন আশুরার দিন তোমরা একত্রিত হয়ে কুকর্মে লিপ্ত হয়। একটি দল ঐ দিনকে মাত্রমের দিনে পরিণত করছে। তোমরা কি জান না যে, সকল দিনের মালিক আল্লাহ এবং সকল দুর্ঘটনা তাই ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। হযরত হুসেইন (রা)-কে যদি ঐ দিন শহীদ করা হয়ে থাকে, তাহলে এমন কোন দিন আছে, যে দিন খোদার কোন প্রিয়তম বান্দার মৃত্যু সংঘটিত হয়নি। কিছু লোক ঐ দিনটিকে খেলার দিন পরিণত করছে। অতপর শবহরাতের দিন তোমরা মৃত্যু জাতিদের ন্যায় খেলা-খুলায় মাত্র হও। তোমাদের একটি দল মনে করে যে, ঐ দিন মৃদুদারের নিকট বেশী করে খাদ্য পাঠানো উচিত। যদি তোমরা এ ধারণার পেছনে কোনা সত্যতা থাকে, তাহলে এ ধারণা ও কার্যের সমর্থনে কোনা দলিলে পেশ করো। আবার তোমরা এমনসব রসমও বানিয়ে রেখেছো যার ফলে তোমাদের জীবনধারা সংকীর্ণতর হয়ে আসছে। যেমন বিবাহে অমিতবায়িতা, তালাকে নিষিদ্ধ কর্মে পরিণত করা, বিধবা মেয়েদেরকে অবিরামিত বসিয়ে রাখা। এ ধরনের রসম-রেওয়াজের পেছনে তোমরা নিজেদের জীবন ও সম্পদ নষ্ট করছো। তোমরা সত্য ও সুদর্শনের হেদায়েতকে পরিত্যাগ করছো। আর এ রসম-রেওয়াজের মূহূর্ত বর্জন করে নিজেদেরকে এমন পথে চলা উচিত ছিল যে পথে কাঠিন নয় বরং সহজ। তোমরা মৃত্যুর দুঃখে ঈদে পরিণত করছো। মনে হয় যেন তোমাদের ওপর ফরস করে দেয়া হয়েছে যে, কারোর মৃত্যু হলে তার আল্লাহর সজ্ঞাতি বিরাট ভোজসভা অনুষ্ঠিত করতে হবে। তোমরা নামায় থেকে পাফেল হয়ে গেছো। অনেকে নিজের কাজ-কার্যকারিতা করে এতবাদী ব্যাপার থাকে যে, নামায় পড়ার সময় পায় না। অনেকে বিলাসিতা ও খেচঘরের মধ্যে এতবাদী মন্ডল থাকে যে, নামায়ের কথা বিষ্মৃত হয়ে যায়। তোমরা যাকাতে থেকে পাফেল হয়ে গেছো। তোমাদের মধ্যে এমন কোনো ধরিনেই, যে বাইরের বহুলোকের খাওয়ার দায়িত্ব নেয়নি। তারা ঐ সমস্ত লোকের খাওয়া-পরায় দায়িত্ব পালন করে কিন্তু কখনো যাকাত ও ইবাদতের নিয়ত করে না। তোমরা রমযানের রোয়াহ পড়বে এই অবধি।"
নষ্ট করো। এজনে নানান ওজন গেশ করে থাকো। তোমরা নিতাংস্ত অকর্মণ্য ও অবিচক্ষ হয়ে পড়ছে হো। তোমাদের ভরণ-পোষণ বাদশাহ প্রদত্ত অজীবা ও পদমৌর্যাদার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। যখন তোমাদের বোঝা হবে করার জন্য বাদশাহদের ভাগার অপারাগ হয়, তখন তারা প্রজাদের ওপর নাহক যুলুম নির্ধারন চালাতে শুরু করে ---- ২৬

তাফহীমাতের আর এক স্থানে বলেন গুলো

"যাহার মনকামনা পূর্ণ করার জন্যে আজমীর অর্থ সালারে মাসুদের কবরে বা এই ধরনের অন্যান্য স্থানে যায়, তারা এতবড় গোনাহ করে যে, হত্যা ও জিনার গোনাহ তার তুলনায় কিছুই নয়। এর মধ্যে আর নিজের মনগড়া মারুদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? যারা 'লাত' ও 'উজ্জা'-এর নিকট প্রার্থনা করে। তাদের কাজ এদের কাজ থেকে কোনো দিক দিয়ে পৃথক হয়, আর এতে একটি পার্থক্য আছে যে, তাদের তুলনায় এদেরকে আমরা দ্বীরহীন ভাবে কাফের বলতে দিকা করি। কেননা এদের এই বিশেষ ব্যাপারে নবী কীর্তির সুপ্রস্তুতি নির্দেশ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন মৃত্তকে জীবিকা পণ্য করে তার নিকট মনকামনা পূর্ণ করার জন্যে প্রার্থনা করে, নীতিগতভাবে তারদিকে গোনাহে লিয়ো হয়। ২৭

এ উদ্ভূতি বেশ দীর্ঘ হয়ে গেলো। কিন্তু তবুও তাফহীমাতের দ্বিতীয় খণ্ডের আরো কতিপয় উদ্ভূতি পাঠকদের সমুদ্রে উপস্থাপিত করা নেহায়েত জরুরী মনে করি। শাহ ওলিউল্লাহ বলেন ন।

হাদিসে বর্ণিত আছে: "নবী করিম (স) বলেন যে, তোমরাও অবশেষে তোমাদের পূর্বাপেক্ষা জাতিদের পথে অব্যাহত বলবে। তারা যেখানে যেখানে পা রেখেছিল তোমরাও ঠিক সেখানে পা রাখবে। এমন কি তুমি যদি কোনো গোসাপের গত্ত হতে চুকিয়ে থাকো, তাহলে তোমরাও সেখানে হতে চুকিবে। সাহায্যে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, হে খোদার রসূল! পূর্বাপেক্ষা উষ্ণতার বলতে কি আপনি ইহুদী ও ঈসায়ীদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন? নবী করিম (স) বলেন, তারা ছাড়া আর কারা হতে পারে?" এ হাদিসটি বুখারী ও মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন।

"খোদার রসূল (স) ঠিকই বলেছেন। আমরা এ চর্চাকে সেসব দুর্বল ঈমানের অধিকারী মুসলমানদেরকে প্রত্যক্ষ করেছি, যারা সৎলোকদেরকে খোদার পরিবর্তে মারুদে পরিণত করেছে এবং ইহুদী ও ঈসায়ীদের ন্যায়

২৬. তাফহীমাতে ইলাহিয়া, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৪-২১৯
২৭. তাফহীমাতে ইলাহিয়া, দ্বিতীয় খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা।

www.icsbook.info
নিজেদের অলি-আওলিয়ার কবরসমূহকে সিজদা করছে। আমরা এমন লোকও দেখেছি, যারা নবী করিম (স)-এর বাণী বিকৃত করে একথা তাঁরই মুখ নিঃসৃত বলে দাবী করেন যে—‘নেক লোকেরা খৌঁদার জন্যে এবং গোনাহগার লোকেরা আমার জন্যে।’ এটি ঠিক ইসলামীদের লেখা হচ্ছে না।

লন তোমাদের নারী একা মেয়দান নয়। আমার হলো মায়ের কাছে ইচ্ছা করেছি। কথাটির মতো। সত্যি বলতে কি আজকাল প্রত্যেক দলের মধ্যে দীনকে বিকৃত করার প্রবণতা বিস্তৃত হচ্ছে। সুফিদের অবস্থা দেখো, তাদের মধ্যে এমনসব কথার অবাধ প্রচলন দেখা যাচ্ছে যে, যা কুরআন ও সুন্নার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়, বিশেষ করে তৌফিকদের প্রশ্নে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, তারা শরীয়তের কোনো পারোয়া করে না। ফকিহদের ফিকাহকে দেখো, তার মধ্যে এমন সব কথা আছে যার উৎসের কোনো সন্দেহই পাওয়া যায় না। যেমন দশ হাত দর্শন এবং দশ হাত স্পর্শ বিশিষ্ট হয়ে গিয়ে সমস্ত পানির বিষয় ২৮ এবং কৃপণ পানি পাক করার বিষয়টি। ২৯ এছাড়া যুক্তিশাস্ত্রবিদ, কবি, ভিত্তিপতিও জনগণের বিকৃতির তো।

এ উত্তরাধিকারী থেকে একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করা যেতে পারে যে, শাহ ওয়ালিউদ্দৌলাহ কত বিন্দুনির্ভরভাবে মুসলমানদের অতীত ও বর্তমান পার্থিবনাথনা করেছিলেন এবং কত ব্যাপকভাবে এর সমালোচনা করেছিলেন।

এ ধরনের সমালোচনার অপিরিহার্য ফল এই দাবীয় যে, সমাজে যত সংলক্ষণ থাকে, যাদের বিবেক ও ইমামে জীবন প্রবাহ এবং অন্যজাত ভালোমন পার্থিক বিকাশ থাকে, পরিস্থিতির অনুভূতি অনুভূতি তাড়াকল এবং তাদের চিত্তের অনুভূতি করে তোলে। তাদের ইসলামী অনুভূতি তীব্রতর হয় এবং নিজস্ব চতুর্থাকার জীবনকালীন জাহেলিয়াতের প্রত্যাঙ্ক চিহ্ন তাদের চোখে কাঁদার মত ভিড়ে তাদের পার্থিক কর্ত্তা এটি বেড়ে যায় যে, জীবনের প্রত্যেক অংশে তারা ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মিশ্রণ বিশেষ করতে তৎপর হয়। তাদের ইমামী পরিচিতি এই জেগে ওঠে যে, জাহেলিয়াতের কাঁদাকে প্রত্যাঙ্কে ও কাঁদাকের প্রত্যাঙ্কে তাদের সন্তূজ ও সন্দেহের জন্যে অন্ধকার করে তোলে।

তাদের পুনর্গঠনের একটি সুসম্প্রতি নকশা তাদের সমস্ত পেশ করা মুজাদদের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যাতে করে বর্তমান অবস্থাকে পরিবর্তন করের যে নতুন রূপ দান করতে হবে তার ওপর তারা নিজেদের দৃষ্টিকোণের স্পর্শিত করতে

২৮. অর্থাৎ হাইদ দশ হাত লম্বা এবং দশ হাত চোদা না হলে তার পানি ‘মায়ে কাসীর’ বা বেশি পানি বলে গণ্য হবে না।

২৯. অর্থাৎ কোনো প্রাণী কুমায় পড়লে কত বালতি পানি বের করে দিতে হবে।

৩০. তুমসুন মাতে ইলাহিয়া, বীরিয়া খুল, পৃষ্ঠা ১৩৪-১৩৫)
গঠনমূলক কাজ

গঠনমূলক ব্যাপারে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এই যে, তিনি ফিকাহশাস্ত্রে একটি যুক্তিপূর্ণ মাধ্যমপথ পেশ করেন। এতে একটি বিশেষ ময়হাবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও অন্য একটি ময়হাবের সমালোচনা করা হয়নি।

একজন গভীর অনুসন্ধানকারীর ন্যায় তিনি সকল ফিকাহভিত্তিক ময়হাবের নীতি-পদ্ধতি অধ্যয়ন করেন এবং ব্যাধিকОсновরে রায় কায়েম করেন। কোনো ময়হাবের কোনো বিষয়ের স্পষ্ট যুক্তি ও প্রমাণ লাভ করার কারণেই তিনি তাঁর প্রতি সমর্থন জানান—সেই ময়হাবের সাফাই গাইবার জন্যে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর প্রতি সমর্থন জানাননি।

আবার কোনো ময়হাবের কোনো কোনো বিষয়ের বিরোধিতা এজন্য করেছেন যে, যুক্তি ও প্রমাণ তাঁর বিরুদ্ধে পেয়েছেন—এজন্যে নয় যে, ঐ ময়হাবের বিরুদ্ধে তাঁর মনে কোনো প্রকার বিদ্রেষ আছে। এ কারণেই কোথাও কোথাও হানফী, কোথাও শাফেয়ী, কোথাও মালিকী আবার কোথাও হামলী রূপে দেখা যায়। যেসব লোক একটি বিশেষ ময়হাবের জোয়াল কাঁধে করে নিয়েছে এবং সকল বিষয়ে তাঁরই অনুগত করার জন্যে কসম খেয়ে বসেছে, তিনি তাঁদেরও বিরোধিতা করেন।

তাঁদেরও তাঁদেরও বিরোধিতা করেন, যারা বিভিন্ন ময়হাবের ইমামগণের মধ্যে কোনো বিশেষ একজনের বিরোধিতা করার জন্যে কসম খেয়ে বসেছে। এ উভয় পথের মাঝামাঝি তিনি একটি ভারসাম্যমূলক পথে অগ্রসর হন, যার ওপর প্রত্যেক সত্যাসন্দ্ধানী ব্যক্তি নিশ্চিত হতে পারে। তাঁর ‘ইনসাফ’ বইয়ে তাঁর এ পদ্ধতির প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর ‘মুসাফফা’ এবং অন্যান্য বইতেও এই মতবাদের পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

তাফহীমের এক স্থানে লেখেনঃ

“আমার মনে একটি চিত্ত উদগম হয়েছে যে, আবু হানিফা ও শাফেয়ীর ময়হাব মুসলিম উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত। এ দু’জনের ময়হাবকে সর্বাধিক সংখ্যক লোক অনুসরণ করে এবং বিপরীতে এদেরই সবচাইতে বেশী। ফকির, মুহাম্মদ, মুসাফিসির, মুতাকালিম ও সুফিদের অধিকাংশই শাফেয়ী ময়হাবের অনুসারী। অন্যদিকে সরকার ও জনসাধারণের বেশীর ভাগ হাফফা ময়হাবের অনুসারী। বর্তমানে আসমানীতেকের সাথে সামঞ্জস্যশীল সত্য বিষয়টি হলোঃ এই দুটি ময়হাবকে একটি ময়হাবের
রূপ দান করা, উভয় মহাবের বিষয়াবলীকে নবী করিম (স)-এর হাদিসের মাধ্যমে যাঁচাই করা। যাকিছ হাদিসের অনুসারি হবে, তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং যার কোনা উৎস না পাওয়া যায়, তাকে বাতিল করা। অতঃপর যাঁচাই-বাচাইর পরে যে মতগুলো প্রতিষ্ঠিত থাকবে সেগুলো সম্পর্কে যদি উভয় মহাবেই ঐক্যমতে পৌছে তাহলে সেগুলোকে অবশ্য দাঁত দিয়ে মজবুতভাবে অঁকড়ে ধরা উচিত আর যদি সেগুলোর ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে উভয়ের মতই স্থীর করে নেয়া উচিত এবং এ উভয় মত কার্যকরী করাকে নির্ভুল গণ্য করা উচিত। সেগুলো সম্পর্কে মতবিরোধ কুরআনে কেরাতের বিভিন্নতার সম্পর্কিত হবে অথবা রূপসাত ও আদিমের তাত্ত্বিক পরামর্শ ও সমর্পণ করে তাত্ত্বিক হবে অথবা এ পরামর্শ হবে কোনা জটিল বিষয় থেকে বের হবার দুটি পথের পরামর্শের নায়। যেমন একান্ত কাফেরা অথবা দুটি মানুষ মোবাইল বালিগার সম্মত অধ্যায়ে এ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তাও প্রণীত হয়।

‘ইনসাফ’-এ তিনি এর চাইতেও বিষ্ঠারিতভাবে নিজের রায় পেশ করেছেন। বিশেষ করে তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি যা লিখেছেন তা এমন পর্যায়ের যে, আহলে হাদিস (সরাসরি হাদিসের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান অনুসন্ধানকারী) ও আহলে তাহরীজ (ইমমগণের ইজিতহাদের অনুসারি) উভয়কেই সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-বিশেষণ করা উচিত। এ আলোচনায় তিনি যে পদ্ধতিকে অপারাধিক দিয়েছেন, তাহলে আলিস অনুসারি ও আহলে তাহরীজ উভয় পদ্ধতিকে অবহিত করা। অনুরূপভাবে হৃদয়ের হলিলি বালিগার সম্মত অধ্যায়ে এ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তাও প্রণীত হয়।

এ মধ্যপথ গ্রহণ করার ফলে বিশেষ, সংকীর্ণমতা, অস্ত অনুসন্ধান ও অন্যান্য দীর্ঘ আলোচনায় সময় নষ্ট করার অবসান ঘটে এবং ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসন্ধান ও ইজিতহাদের পথ উন্মুক্ত হয়। এজন্যেই শাহ ইয়ালিউল্লাহ

৩১. কোনা কাজ না করার ব্যাপারে শরীয়ত কর্তব্য সুবিধা প্রদানকে রুখত এবং শরীয়ত কর্তব্য সুবিধা প্রদান করার সাথে এই কাজ করতে মূল সংক্রমন হওয়াকে আদিম বলা হয়।—অনুবাদ

৩২. যেমন ইচ্ছা করে কোনা রোহা ভাবে তার কাফেরা আদিমের নিয়ম হলো এই যে, পরপর ৬০টি রোহা রাখতে হবে অথবা ৬০জন দর্দক্কে খাওয়াতে হবে। দুটির যে কোনা একটি গ্রহণ করলেই চলবে।

৩৩. তাফহীমতে ইলাহিহ, প্রথম ২৭, পৃষ্ঠা-২১১-২১২।

www.icsbook.info
এই সংখ্যা ইজিহিদাদের প্রায় জন্মের ওপরও জোর দেন। এবং তাঁর প্রয়োগ প্রাতোকটি বহিতে বিভিন্ন আলোচনায় বিভিন্নভাবে ইজিহিদাদ ও অনুসন্ধান করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মুসাফ্ফার ভূমিকা থেকে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃতি করছি:

"ইজিহিদাদ প্রতি যুগে ফরমে কেরায়া। এখানে ইজিহিদাদ অর্থ হলো শ্রীরিতের বিধানাবলী সম্পর্কে পুরুষ জান অর্জন এবং তাঁদের বিশ্বাস ও বুদ্ধিনীতি ব্যাখা অনুশীলন করে শ্রীরিতের আইন-কানুনে যথাযথ-ভাবে সংযোজন ও সংগঠন করা, যা কোনো বিষয় ময়হাব প্রচ্ছদার অনুসারীও হতে পারে। আর ইজিহিদাদ প্রতি যুগে ফরমে যে কথা বলেছি, তা এজন্যে যে, প্রতি যুগে অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। সেগুলো সম্পর্কে বোদর নির্দেশ জানা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। আর ইতিপূর্বে যে সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ ও সংকল্পিত হয়েছে, তা এ ব্যাপারে যথেষ্ট হয় না বরং তার মধ্যে নানান মতবিচারও থাকে। শ্রীরিতের মৌল বিধানের দিকে প্রভাবশালী না করে এ মতবিচার দূর হওয়া সক্ষম হয় না। এ ব্যাপারে মুজতাহিদগণ যে পদ্ধতি নির্ণয় করেছিলেন তাও মাঝপথে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। কাজেই এ ক্ষেত্রে ইজিহিদাদ ছাড়া গত্যস্তর নেই।" ৩৪

শাহ ওয়ালিউদ্দেহ ওধু ইজিহিদাদের ওপর জোরই দেননি বরং তিনি বিশ্বাসিতভাবেই ইজিহিদাদের নিয়ম-নীতি, সংবিধান ও শাস্ত্রাবলী বর্ণনা করেছেন। ইয়ালাকুল খিলাম, হক্কাতুস্তাহিল বালিগাহ, আক্কাদুল জীদ ইনসাফ বুদ্দের বাজিগাহ, মুসাফ্ফার প্রতিষ্ঠাতা কেঠাও তার নিছক ইলিগেসে আবার কোথাও বিশ্বাসিত বর্ণনা রয়েছে। উপরের তাঁর লিখিত বই-পুস্তকে যেখানেই তিনি কোনো বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, একজন সত্যিনুসন্ধানী ও মুজতাহিদের ন্যায় তা করেছেন। অর্থাৎ তাঁর বই-পুস্তক অধ্যয়ন করে মানুষ ওধু ইজিহিদাদের নীতি-নিয়মই জানতে পারবে না বরং এই সংগে এ বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারবে।

উল্লেখিত কাজ দুটি শাহ ওয়ালিউদ্দেহ পূর্ববর্তী লোকায় করেছেন। কিন্তু যে কাজ তাঁর পূর্ববর্তী আর কেউ করেনি, তাহলে এই যে, তিনি ইসলামের সমর্থ চিতা, নৈতিক, তমুদ্রান্ত ও শ্রীরিত ব্যবহার করে লিপিবদ্ধ আকারে পেশ করার চেষ্টা করেছেন। এ কাজের ব্যাপারে তিনি তাঁর পূর্ববর্তীগণের থেকে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। যদিও প্রথম তিন চার সম্ভবত অনেক বেশী ইমামের আবির্ভাব হয়েছে, এবং তাঁদের কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে পরিস্কার দেখা।

৩৪. মুসাফ্ফার, প্রথম খোল, পৃষ্ঠা-১১।
যাবে যে, তাঁদের চিত্ত রাজ্যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ চিত্র ছিল এবং অনুরপভাবে পরবর্তী শতাব্দীগুলোরও এমন অনেক অনুসন্ধানকারীর সাক্ষাত
পাওয়া যায়, যাঁদের সম্পর্কে ধারণা করা যায় না যে, তাঁদের চিত্রাঙ্কে এ চিত্র
শুন্য ছিল ; তবুও তাঁদের একজন মুনিমিত্র ও যুক্তিভাবনা পদ্ধতিতে ইসলামী
ব্যবস্থাকে একটি ব্যবস্থা হিসাবে লিপিবদ্ধ করার দিকে দৃষ্টি দেননি। এ সম্মান
শাহ ওয়ালিউদ্দাল্লাহর জন্য নির্ধাতিত হয়েছিল যে, তিনিই হবেন এ পথের
পথিকৃত। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে এটিই হুজাজুল্লাহ ও বুদরুল্লাহ বাজিগাহ
ধ্বন্যায়ের আলোচনা বিষয়। প্রথমে এটে এ আলোচনা অধিকতর বিষয়িত
এবং শেষের দিকে প্রায়শঃই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিত।

এ পুনর্গ্রন্থে তিনি অতিরঞ্জিত বিশ্বাসী থেকে আলোচনা শুরু
করেছেন। ইতিহাসে এ প্রথমবার আমরা এক ব্যক্তির ইসলামী দর্শন লিপিবদ্ধ
করণের ভিত্তিস্থাপন করতে দেখি। এর আগে মুসলিমদের দর্শন সম্পর্কে যা
কিছু বলেছেন ও লিখেছেন, লোকেরা নিষ্ঠুর অগ্রতাবাদী তাকে “ইসলামী
দর্শন” নামে আখ্যায়িত করেছে। অথচ তা ইসলামী দর্শন নয়, মুসলিম দর্শন।
তার বংশসূত্র গ্রীস, রোম, ইরান ও হিন্দুস্তানের সাথে সম্পর্কিত। অনেকে যে
বস্তু এ নামে আখ্যায়িত করার মোট দিনের এ শাস্ত্রী সম্প্রসারণ তার
ভিত্তিস্থাপন করেন। যদিও পরিভাষার ক্ষেত্রে পুরুত্ব দর্শন ও কালাম শাস্ত্র
অন্ধ্ব দর্শন ভিত্তিক তাসাউফের শব্দ শব্দার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং
অচেতনভাবে সেখানকার বহু চিত্র ও ধারণা গ্রহণ করেছেন যেমন, প্রথম প্রথম
প্রত্যেক নতুন পথ আবিষ্কারকের জন্যে স্বভাবতই অপরিহার্য হয়ে পড়ে—তবুও
গবেষণা অনুসন্ধানের যায়। দারোদারোদের ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট প্রচেষ্টা।
বিশেষ করে এমন চরম অবনতির যুগে এতবড় শক্তিশালী যুক্তিভাবী ব্যক্তিগত
প্রকাশ একটি বিশ্বায়কর ঘটনা।

এ দর্শনে শাহ ওয়ালিউদ্দাল্লাহ বিশ্বজাহান ও বিশ্বজাহানের মধ্যে মানুষ
সম্পর্কে একটা ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন, যা ইসলামের নৈতিক ও
তাম্রোলিক ব্যবস্থার সাথে সমঝোতা এবং তার সম্ভাবনা প্রকৃতির অধিকারী
হতে পারে। অথবা অন্য কথায় তাকে যদি ইসলাম ব্যক্তি কাউ গণ্য করা হয়,
তাহলে সেই কাউ এবং তা থেকে যে ব্যক্তির উত্থান হয়েছে তার মধ্যে বস্তুতঃ
কোনো সাহাবক পার্থক্য অনুভূত হতে পারে না। ৩৫ আমি আশ্চর্য হই যখন

৩৫। মুসলিমদের মধ্যে যে দর্শনের প্রচলন ছিল ইসলামের নৈতিক ও অবিচার ব্যবস্থার সাথে তার
কোনো সম্পর্ক ছিল না। এছাড়াও তার প্রচলন সত্যপূর্বী বৃদ্ধি হয়েছে মুসলিমদের জীবনে নতুনশীল বিকাশ
হয়েছে। যুক্তিভাবী দৃষ্টির সাথে সাথে চরিত্র দৃষ্টিকোনও শিখিয়েছেন এবং সংস্কার পূর্বে
শিখিয়েছিলেন। পরস্পর বিমূর্ত চিন্তার ছদ্মের এটি তার কোনো চিহ্নিত কৃত্তি। তাম্রোলিক পাণ্ডুলিপি
দর্শনের প্রচলনেও এই একই নতুন প্রকাশ
ঘটেছে। কোনো পাণ্ডুলিপি দর্শনের চিন্তার নতুন প্রকাশ
ও পরিণত হয়।

www.icsbook.info
কোনো কোনো ব্যক্তিকে একথা বলতে তুমি বলে, ‘শাহ ওয়ালিউল্লাহ বেদান্ত দর্শন ও ইসলামী দর্শনের সূত্র মিলিয়ে নয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্যে চিত্ত বুদ্ধিয়াদ সংঘার চেষ্টা করার চেষ্টা করেছিলেন।’ তাঁর এই সমুহের এ প্রচেষ্টার কোনো সমানই আমি পাইনি। আর যদি সত্যি এর কোনো সন্ধান পেতাম, তাহলে খোদার শপথ শাহ সাহেবের নাম মুজাজাদিদগণের তলিকা থেকে কেটে বাদ দিয়ে আমি তাকে মুজাজাদিদগণের কভারে দাড় করিয়ে দিতাম।

নৈতিক ব্যবস্থার ওপর তিনি একটি সমাজ দর্শনের ইমারত নির্মাণ করেন। ‘ইরিতিফাকাত’ (মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রম) শিরোনামায় তিনি এর বর্ণনা শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে পারিবারিক জীবন সংগঠন, সামাজিক আদর-কায়দা, রাজনীতি, বিচারবিধি, কর ব্যবস্থা, দেশ শাসন, সামরিক সংগঠন প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন এবং এই সংগে সমাজ সভ্যতার বিপর্যয় ও বিকৃতি সৃষ্টির কারণসমূহের ওপর আলোকপাত করেন।

অতঃপর তিনি শরীরত, ইবাদত, আহকাম ও আইন-কানুনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা পেশ করেন এবং প্রতোকটি জিনিসের পূর্ণ তত্ত্ব বুঝা থাকেন। ইমাম গাজালী (র) তাঁর পূর্বে যে কাজ করেছিলেন এ বিশেষ বুঝার ওপর তাঁর কাজ সেই একই পর্যায়ের। তাঁর স্বভাবভাবেই এ পথে তিনি ইমাম গাজালী থেকে অনেক দূরে আত্মসর হয়ে গেছেন।

শেষের দিকে তিনি বিভিন্ন জাতির ইতিহাস ও আইন-কানুনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। কমপক্ষে আমার জানানো, তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম ও জাহেলিয়াতের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের একটি আবহা ধারণা পেশ করেন।

ফলাফল

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এছাড়া যুক্তিগাথা ও সুসংরক্ষিত খসড়া পেশ হবার অর্থই হলো এই যে, তাঁ সকল সুস্থ প্রকৃতির ও বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হবে ও তাদের মধ্যে যারা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী তারা এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করে দেবে। এ লক্ষ্যে ব্যক্তি নিজে কার্যত এমন আলোকালের নেতৃত্ব দান করবে বা না করবে, তাতে বিশেষ কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। কিন্তু যে বস্তুটি এর চাইতেও বেশী আলোড়ন সৃষ্টিকরী প্রমাণিত হয়, তাহলো এই যে, শাহ সাহেব জাহেলী রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যকার পার্থক্যে সৃষ্টির জন্য সে পেশ করেন এবং কেবল ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে ক্ষমতার থাকেননি বরং এ বিষয়টিকে বারবার এমন প্রতিষ্ঠিত পেশ করেন যার ফলে ইসমানদারদের পক্ষে জাহেলী রাষ্ট্র ক্ষমতাকরে সে সমুহ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত।
করার জন্য প্রচেষ্টা না চালিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। এ বিষয়টি হজ্জাতুল্লাহিল বালিগার মধ্যে যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর ইজালা যেন কেবল এ বিষয়টির ওপরই লিখিত হয়েছে বলে মনে হয়। এ বইটিতে তিনি হাদীসের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, ইসলামী খিলাফত ও রাজতন্ত্র দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। অতঃপৰ একদিকে রাজতন্ত্র এবং সেবা বিপর্যয়কে ছাপন করে যেখানে ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে রাজতন্ত্রের পথে মুসলমানদের সামাজিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে এবং অন্যদিকে ইসলামী খিলাফতের বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলী এবং সেবা অবদান পেশ করেন যা ইসলামী খিলাফত আমলে প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের উপর নাযিল হয়। এরপরও মানুষের পক্ষে নিশ্চিতে বসে থাকা কেমন করে সম্ভব হতে পারতো?

---------------
এ কারণে শাহ ওয়ালিউদ্দালাহর মৃত্যুর পর অর্ধশতক অতিক্রম হবার আগেই ভারতবর্ষে একটি আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো। শাহ ওয়ালিউদ্দালাহ জগতের দৃষ্টি সমক্ষে যে লক্ষ্যবিদ্ধ উজ্জ্বল করে গিয়েছিলেন এ আন্দোলন ছিল সেই একই লক্ষ্যের অনুসারী। সাইয়েদ সাহেবের পত্নীর ও বানী এবং শাহ ইসমাইল শহীদের ‘মানসারে ইমামত’, ‘উক্তিবাদ’, ‘তাকবিরাতুল ঈমান’ ও অন্যান্য রচনাবলী পাঠ করলে উল্লেখ্য হবে যে শাহ ওয়ালিউদ্দালাহই সরবর কর্ণ শ্রুত হবে।

শাহ সাহেব কার্যত জানতেন, তাহলে এই যে, তিনি হাদিসে ও কুরআনের শিক্ষা এবং নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সৎ ও চিন্তাসম্পন্ন লোকদের একটি বিরাট দল সৃষ্টি করেন। অতিরিক্ত তার চার পূর্ণ বিশেষ করে শাহ ‘আবদুল আজিজ’ (র) বিপুলভাবে এ দলটির কলাবর বৃদ্ধি করেন। তার প্রচেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার ব্যক্তি হয়েছিল পড়েন। তারা ছিলেন শাহ ওয়ালিউদ্দালাহর চিন্তার ধারক, তাদের হুমকি পেঁজে ইসলামের নির্ভুল চিন্তা অর্থক ছিল। তারা নিজেদের বিদ্যা, বৃদ্ধি ও উন্নত চরিত্রের কারণে সাধারণ লোকের মধ্যে শাহ ওয়ালিউদ্দালাহ ও তাঁর শাসকদের প্রভাব প্রতিষ্ঠাত করার মাধ্যমে পরিণত হন। এ জিনিসটি পরম্পরাগত সেই আন্দোলনের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, যেটি শাহ সাহেবের ভক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে বরং তাঁর গৃহ থেকে জন্মলাভ করার প্রতীক্ষায় ছিল।

সাইয়েদ আহমদ বেরিলভী (র) ও শাহ ইসমাইল শহীদ (র) উভয়ই আত্মক্ষেপন ও চিন্তাগত দিক থেকে একই অস্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আর এই একই অস্তিত্বের আমি ব্রতে মুজাদ্দিদ মনে করি যা বরং শাহ ওয়ালিউদ্দালাহর তাজদীদের পরিষ্কর মনে করি। তাদের কর্মকার্যের সংক্ষিপ্ত সার হল ৪।

১. তাঁরা সাধারণ মানুষের ধর্ম, চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও লেন-দেনের সংক্ষেপের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফেরত হলে তাঁদের প্রভাব পৌঁছে সেখানে জীবন ধরায় এমন বিপুল বিপ্লব সাধিত হয় যে, মানুষের চেনে সাহাবাদের জামানার চিত্র ভেঙে উঠে।

সাইয়েদ আহমদ ১২০১ হিজরিতে (১৭৮৬ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন ও ১২৪৬ হিজরিতে (১৮৩১ খ্রীঃ) শাহাদাত বরণ করেন। শাহ ইসমাইল শহীদ ১১৯৩ হিজরিতে (১৭৭৯ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন ও ১২৪৬ হিজরিতে (১৮৩১ খ্রীঃ) শাহাদাত লাভ করেন। সমস্ত ১৮১০ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে সাইয়েদ আহমদের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের শিখা প্রজ্জলিত হয়।

www.icsbook.info
২. উনিবিংশ শতকের প্রথমদিকে ভারতের নয়া একটি পতননুর্বুখ দেশ তারা যেভাবে ব্যাপকরে জিহাদের প্রত্যাহার করেন এবং এ প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে যেভাবে নিজেদের সাংঘঘটিক যোগ্যতার পূর্ণতা প্রকাশ করেন, তা এক প্রকার অসমাপ্ত ছিল। অতঃপর একজন দূরদিশিত সাথে তারা কার্যার্থের জন্য উত্তর-পশ্চিম ভারত বর্ষকে নির্বাচিত করেন। বলা বাহুল্য, মূল্যমন্থন ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটি ছিল এ কাজের উপযোগী স্থান। অতঃপর এ জিহাদে তারা এমন চরিত্রের ও যুদ্ধ আইন ব্যবহার করেন যে, তার মাধ্যমে একজন দুনিয়াদার সাধারণাধিকারিতা মানুষ মোকাবিলায় একজন খোদার পথে জিহাদকারী বিশ্বাসী অর্জন করতে সক্ষম হয়। এভাবে তারা দুনিয়ার সমুখে আর একবার সাধারণ এসিয়াম আদর্শ ও ধার্মিক সংগঠন বিকাশ ঘটায়। তাদের যুদ্ধ দেশ, জাতি বা দুনিয়ার সাধারণসত্ত্বেও ছিল না। বরং একত্রিতভাবে খোদার পথে ছিল। খোদার সৃষ্টিকে আহ্বালিয়াতের শাসনমুক্ত করে তাদের ওপর ব্যাপক ও বিশুদ্ধজাতের মালিকের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া তাদের বিভাগীয় কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নিয়মানুসারী প্রথমে তারা ইসলাম অথবা জিহাদের দিকে আহ্বান করেন। অতঃপর নিজেদের পক্ষ থেকে পূর্ণতাপ্য নিশ্চিত হবার পর তারা অত্যাধুর করতেন। আর অত্যাধুরণ করার পর ইসলামের মাজিত ও উপন্য যুদ্ধ আইনের পূর্বপুরুষ অনুগত করতেন। কোনো নির্যাতনসমূহ ও হিস্তারাকর্তা তাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়। তারা যে লোকালয় প্রবেশ করেন, সংক্রামক হিসাবেই প্রবেশ করেন। তাদের সেনাদলের সংগে শান্ত থাকতে না, ব্যাপার বজায় না, পতিতদের পল্টন তাদের সংগে থাকতে না, তাদের সেনানিবাসে বিভীষিতদের আড়ালখানায় পণ্ডিত হতে না এবং এমন কোনো দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়নি যে, তাদের সেনাদল কোনো স্থান অতিক্রম করেছে আর সেখানকার মহিলাকে তাদের তীরীক্ষ হারিয়ে মাত্রম করতে বসছে। তাদের সিপাহীরা দিনের বেলায় ঘোড়ার পিঠে আর রাতে জায়গামায়ের ওপর থাকতেন।

তারা খোদার তর্কে না থাকতেন, আঘাতের হিসাব ও বিকাসভিত্তিক হামেশা সমুদ্ধ রাখতেন। এ ব্যাপারে তারা কোনো প্রকার নিত্য-ক্ষতির পরোয়া করতেন না। তারা কোথাও পরাজিত হন কারণ দৈনন্দিত্ত হননি। আবার কোথাও বিজয় লাভ করে নিষ্ঠুর ও অহংকারী প্রমাণিত হননি। তাদের আগে ও পরে এ ধরনের নির্ভর্জাল ইসলামী জিহাদ আর অনুষ্ঠিত হননি।

৩. তারা একটি ক্ষুদ্রতম এলাকায় বল্কানীয় রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ লাভ করেন। এ সময় তারা যথাযথ খোলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়াত (নবুয়াতের প্রসাদানুসারী খোলাফত)–এর পদক্ষেপে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ফকীরী শাসন, সামা, পরমার্থ সভা, নায় বিচার, ইনসাফ, শরীয়তের আইন, এক অনুমানী অর্থ
ব্যাখ্যাতার কারণ

এ সর্বশেষ সংক্ষেপ পূর্বতন কারণসমূহ পৃথিবীকে করা সাধারণত তাদের রুচির বিচ্ছেদ যারা নিজেদের মহা মনীষীদের কথা আলোচনা করার পক্ষপাতী। এমন্যে আমার অনেক হচ্ছে যে, উপরের শিরোনামায় আমি যা কিছু পেশ করবো, তা আমার অনেক ভালোর মনোবিচার করণ হবে। কিন্তু পূর্ববর্তী মনীষীগণের উদ্দেশ্য নিছক প্রশ্নাবলী বিতরণ করাই যদি আমাদের এ সমস্ত আলোচনার উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে বরং আমাদের বীরের সংক্ষেপের কাজে তাদের কার্যকারী থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহলে সমালোচনার দৃষ্টিতে ইতিহাস পৃথিবীতে করা বাহুল্যের কারণ হবে এবং এ মনীষীদের কার্যকারী বিশ্লেষণ করার সাথে সাথে উদ্দেশ্য সাধনে তাদের ব্যাখ্যাতার কারণসমূহ অনুসন্ধান করা ছাড়া গতান্তর করে নেই। হাঁ ওয়ালিউবাই (র) এবং তাঁর পৃথিবী হল পরত্ন আলেম ও সকলকর্মের দেশ মহান দল এখন করেন অতপর সাইমুদ আহমদ বেনলিঙ্গী (র) ও শাহ ইসমাইল শাহী (র) এবং যোগাযোগকের দেশ বাহিনী গঠন করেন, তার বিবরণ পড়ে আমরা বিষয়ের অভিব্যক্ত হই। মনে হয়, রুখি আমারা ইসলামের প্রথম যুগের সাহায্য ও তাবীনের জীবন চরিত্র পাঠ করেছি। আমরা অবাক হয়ে বাহির হয়ে অন্তর্ভুক্ত যুগে এমন অভ্যুত্থান উন্নত চরিত্রের লক্ষ্যে আগমন হয়েছিল। কিন্তু এই সংগে আমাদের মনে ব্যাখ্যাতার শত্রু জাগে যে, এতে বড় সংস্কার ও বৈপ্রিক আন্দোলন, যার

৩৬। ব্যাখ্যা অর্থে–সত্যিকার নয়, আপাতত দৃষ্টিতে যে ব্যাখ্যা ধরা পড়ে। ধোদার সত্যু অর্থের অন্য ধীরে প্রতিক্ষিত করার সমসঞ্চার প্রচেষ্টা চালানো মুসলমানদের সত্যিকার সাক্ষাৎ। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা অন্য সত্যিকরণ হয়েছিলেন। তবে তাদের ব্যাখ্যা পার্থিব পূর্বকল্প করে ইসলামসহ করিবিন্দ্ব প্রতিক্ষিত করতে পারেননি। আমরা এরু কারণ সমূহের পৃথিবীতে করবে। যেহেতু পরবর্তীকালে ধীরে প্রতিক্ষিত করার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ঐ কারণসমূহের ব্যাপারে সত্য ধাক্কা সংঘ হয়।
নেতৃবৃন্দ ও কর্মীগণ এমন সৎ, খোদাতীরু ও অক্লান্ত মুজাহিদ ছিলেন, তাঁরা চরম প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও হিন্দুতানে ইসলামীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হননি কেন? অথচ এর বিপরীত পক্ষে সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে আগত ইংরেজ এখানে নির্ভর জাহাজী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। তবে উল্লেখ ও অপেক্ষা হয়ে এ প্রশ্নটির জবাবদানে বিরত থাকার অর্থ এই দাবার যে, লোকেরা সত্য, সতটা, খোদাতীরু ও জিহাদকে খোদার দুয়ীনায় সংশোধনের ক্ষেত্রে দূর্বল প্রভাবের অধিকারী মনে করতে থাকবে। এ চিন্তা তাদেরকে নিরাশ করবে যে, এতেও সৎ ও খোদাতীরু লোকের প্রচেষ্টায় যখন কিছু হলো না তখন ভবিষ্যতেও আর কিছু হবে না। এ ধরনের সন্দেহ আমি লোকদের মুখে শেন্নি। বরং হালে যখন আমি আলিগড়ে যাই, তখন কিন্তু হলের বিরাট সমাবেশে আমার সম্মুখে এই সন্দেহই পেশ করা হয়। এ সন্দেহ অপনোদন করার জন্যে আমাকে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিতে হয়। উপরন্তু আমি এ জন্যে যে অধুনা উলামাও ও সৎলোকের যে বিরাট দল আমাদের মধ্যে আছেন, তাদেরও বেশীর ভাগ এ ব্যাপারে একেবারেই চিন্তাশূন্য। অথচ এ সম্পর্কে, অনূর্ধ্ব চলাচলা হলে এমনসব শিক্ষা আমারা লাভ করতে পারি, যার আলোকে আগামীতে আরো বেহেতের ও অধিকতর নির্ভুল কার্য সম্পাদিত হতে পারে।

প্রথম কারণ

হযরত মুজাহিদে আলফিসানির যুগ থেকে নিয়ে শাহ ওয়ালিউদ্দৌলাহ ও তাঁর প্রতিনিধিত্বের সময় পর্যন্ত যাবতীয় সংগঠনমূলক কাজে যে জিনিসটি প্রথম আমার চোখে বাঁধ, তাহলে এই যে,—তাঁরা তাসাউফের ব্যাপারে মুসলমানদের রোপ পুরোপুরি অনুমোদন করতে পারেননি এবং অন্যতমভাবে তাদেরকে পুনর্বার সেই খাদ্য দান করেন যা থেকে তাদেরকে পূর্ণরূপে দূরে রাখার প্রয়োজন ছিল। তাঁরা যে তাসাউফ পেশ করেন তার মূল কাঠামোর বিরুদ্ধে আমার কেনা আপত্তি নেই বরং প্রাণবন্ধুর দিকে যিয়ে তা ইসলামের আসল তাসাউফ। এ তাসাউফ ‘এহদুন’ থেকে মোটেই ভিন্নতর নয়। কিন্তু যে বক্তৃতাকে আমি পরিত্যাজ্য বলছি, তাহলে তাসাউফের রূপক, উপমা ও ভাষা ব্যবহার এবং তাসাউফের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি জাহি রাখা। বলা বাহুল্য, সত্ত্বারী ইসলামী তাসাউফ এ বিষয়ে খোলের মুখাপেক্ষী নয়। এর অন্য ছোটও আছে। এর জন্যে অন্য একুশ ভাবাও ব্যবহার করা যেতে পারে। উপমা ও রূপক থেকেও অবাহুতি লাভ করা যেতে পারে। পৌর-মুরীদী ও এ ব্যাপারে যাবতীয় বাস্তব আকৃতি পরিহার করে অন্য আকৃতি গ্রহণ করা যেতে পারে।
তাহলে সেই পুরোনো ছাঁচ—যার মধ্যে দীর্ঘকাল থেকে জাহেলি তাসাউফের আধিপত্য চলে আসছিল—তাকে গ্রহণ করার জন্যে চাপ দেয়ার কী-ই বা প্রয়োজন ছিল। এর ব্যাপক ও বিপুল প্রচার মুসলমানদের মধ্যে যেসব কঠিন নৈতিক ও আকিদাগত রোগের সৃষ্টি করেছে, তা বিচরণ ব্যক্তির দৃষ্টির আগোচরে নেই। বর্তমানে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কোনো ব্যক্তি যতই নির্বুল শিক্ষাদান করুক না কেন এ ছাঁচ ব্যবহার করার সাথে সাথেই শত শত বছরের প্রচলনের ফলে এর সাথে যেসব রোগ সংশ্লিষ্ট হয়েছে সেগুলোর পুনরাবিভাগ ঘটে।

কাজেই পানির নায় হালাল বস্তুও যেমন ক্ষতিকর প্রমাণিত হলে রোগীর জন্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, অনুরূপভাবে এ ছাঁচ বৈধ হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র এ কারণেই পরিতাজ্জ্বা যে, এরই আবরণে মুসলমানদের মধ্যে আফিমের নেশা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর নিকটতম হতেই পুরুত্ত রোগীদের মানসপ্ত আবার সেই ঘুমপাড়ানীর কথা ভেসে ওঠে, যে শত শত বছর থেকে গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তাদেরকে নিদ্রাভিন্ন করেছে। পীরের হাতে বায়াত হবার পর মুরিদের মধ্যে সেই বিশেষ মানসিকতা সৃষ্টি হয়, যা একমাত্র পীর মুরিদদের জন্যে নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ "পীরের কথায় শিরাজীর রঙে রঙ্কিন হো"—ধরনের মানসিকতা, যারপর পীর সাহেবে ও গায়করফার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। তাদের চিন্তা ও দৃঢ় যুক্তিরত পৌঁছে, সমালোচনা শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, যুক্তি ও জ্ঞানের ব্যবহার স্পর্শ হয় এবং মন-মতিকের ওপর শায়খের বদনের এমন পরিপূর্ণ আধিপত্য বিতর্ক লাভ করে যার ফলে শায়খ যেন তাদের প্রতিপালক এবং তারা শায়খের প্রতিপালিত হিসেবে পরিগণিত হয়। অতপর কাশফ ও ইলহামের অলেখচনা চুরু হবার সাথে সাথে মানসিক দাসত্বের বাধামূলক আরো বেশী শক্তিশালী হতে থাকে। তাপমাত্র চুরু হয় সুফিদের রুপক ও উপমার প্রাপ্ত। এর ফলে মুরিদদের কঠিনশক্তি যেন চারুক খাওয়া অন্যের ন্যায় তাদেরকে নিয়ে তীর বেগে ছুটতে থাকে। এ অবস্থায় তারা প্রতি মুহুর্তে অতুল তেলেসমাতির দুনিয়ায় সফর করতে থাকেন, বাস্তবের দুনিয়ায় অবস্থান করার সুযোগ তারা খুব কমই লাভ করে।

মুসলমানদের এ রোগ সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ আলফিসানি ও হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ অনবর্ত্ত ছিলেন না। উভয়ের রচনায় এর সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সত্যবাদে এ রোগের ব্যাপকতা সম্পর্কে তাদের পূর্ণ ধারণা ছিল না। এ কারণেই তারা এই রোগীদেরকে পুনর্বার এমন পথ দান করেন যা এ রোগে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছিল। ফলে তাদের উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত
ধীরে ধীরে আবার সেই পুরাতন রোগে আক্রান্ত হতে থাকে। ৩৭ যদিও মাওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ (র) এ সত্য যথার্থরূপে উপলব্ধি করে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর নীতি অনুসরণ করেন, কিন্তু শাহ ওয়ালিউদ্দার (র)-এর রচনাবলীতেই এর যথেষ্ট সাজ-সরস্কার ছিল এবং শাহ ইসমাইলের রচনাবলীও তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন। কাজেই সাইয়েদ আহমদের আন্দোলনেও পীর-মুরিদের সিলসিলা চালু হয়ে গিয়েছিল। তাই সুফিবাদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে এ আন্দোলনও মুক্ত হতে পারেনি। এমন কি সাইয়েদ আহমদের শাহাদাত লাভের পরই তার সমর্থকদের মধ্যে এমন একটি দলের উদ্ভব হয় যারা শিয়াদের ন্যায় তার ‘অদৃশ্য’ হবার কথা বিশ্বাস করেন এবং আজও তার পুনরাবিভাজনের প্রতীক্ষায় আছেন।

বর্তমানে যিনি তাজদীদের দীনের কাজ করতে চাইতেন তাকে অবশ্য সুফিদের ভাষা-পরিভাষা, ব্রহ্ম-উপাসনা, পীর-মুরিদের মসজিদ ও তাদের পশতু ধর্মের নির্দেশ করিয়ে দেয় এমন প্রতিটি জিনিস থেকে মুসলমানদেরকে দূরে রাখতে হবে, এ ক্ষেত্রে বহুমূখী রোগীকে যেমন চিনে থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় মুসলমানদেরকে অনুরূপভাবেই উল্লিখিত বিষয়গুলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

ধীর্ঘকাল

এ আন্দোলনকে সমালোচনার দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করার সময় দ্বিতীয় যে জিনিসটি আমি অনুভব করেছি, তাহলে এই যে, সাইয়েদ আহমদ ও শাহ ইসমাইল শহীদ যে এলাকায় অবস্থান করে জেহাদ পরিচালনা করেন, এবং যেখানে তারা ইসলামী হুকুমত কায়ম করেন, সে এলাকাটিতে পূর্ব থেকেই এ বিপ্লবের জন্যে ভালোভাবে প্রস্তুত করেননি। তাদের সেনাবাহিনী অবশ্য উন্নত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ছিল। কিন্তু তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্ল্যাটফরমে একটি হয়ে উঠেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে তারা ছিলেন মোহাজিরের পর্যায়বৃত্ত। এই এলাকায় রাজনৈতিক বিপ্লব অনুষ্ঠানের জন্যে প্রথমে স্থানীয় লোকদের মধ্যে নৈতিক বিপ্লব অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। এর ফলে স্থানীয় লোকেরা ইসলামী রাষ্ট্রকে বুঝাতে এবং তার সাহায্যকারী (অন্যান্য) হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারতো। উত্তর-পশ্চিম সৃষ্ট এ বিভাগের শিকার হন যে, সীমান্তের লোকেরা যেহেতু মুসলমান এবং আমুসলিম সাধারণের দ্বারা নির্যাতিত, কাজেই তারা ইসলামী শাসনকে স্বাগতম জানাবে। এ জন্যই তারা সেখানে পৌঁছে জিহাদ শুরু করে দেবে এবং যতগুলো দেশ তাদের কর্তৃপক্ষী আঁকে, তার সবগুলোই খেলাফত কায়ম করেন। কিন্তু

৩৭. হযরত মুজাহিদ আলিফসাহার ইতিহাসের পর কিছুদিনের মধ্যেই তার সমর্থকদের মধ্যে তাকে 'কাইউমে আউয়াদ' ও তার খলিফাদেরকে 'কাইউমে সানি' উপাধি দান করে। কাইউম খোদার একটি সিফাত।
অবশেষে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে যায় যে, নামের মুসলমানকে সত্যিকার
মুসলমান মনে করা এবং সত্যিকার মুসলমানের দ্বারা যে কাজ সম্বন্ধ তাদের
নিকট থেকে সে কাজের আশা রাখা একটি নিষ্ঠুর প্রতারণা ছিল। তারা
খেলাফের বোঝা বহন করার শক্তি রাখতা না। তাদের ওপর এ বোঝা
রাখার ফলে তারা নিজেরা ভূপতিত হয়েছে এবং এ পরিত্র ইমারতকেও
ভূপতিত করেছে।

আগামীতে প্রতিটি সংক্ষিপ্তরূপে কাজে ইতিহাসের এ শিক্ষাকে সমুহে
রাখা প্রয়োজন। এ সত্যির পূরোপূরু হ্রদয়জম করা উচিত যে, যে রাজনৈতিক
বিপ্লবের শিকড় সামগ্রিক চিত্ত, চরিত্র ও তমুখনের মধ্যে আমূল বিদ্ব না
থাকে, তা কোনোদি সার্থক হতে পারে না। কোনো সাময়িক শক্তির মাধ্যমে
এমন বিপ্লব কোথাও সংঘটিত হয়ে গেলেও তা হয়তো দালির করতে পারে না।
আর বিলুপ্ত হবার সময় পিছনে তার কোনো প্রয়োজন যায় না। ৩৮

তৃতীয় কারণ

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, এ বৃজরস্তের তুলনায় কয়েক হাজার
মাইল দূর থেকে আগত ইংরেজদের এমন কি প্রশ্রতি ছিল, যার ফলে তারা
এখানে জাহাজের রাস্তা কামের করতে সক্ষম হয়? কিন্তু এরা নিজেদের দেশে
ইসলামী রাষ্ট্র কামের করতে পারলেন না? আঠাসে ও উনিশ ঈশায়ি শতকের
ইউরোপের ইতিহাস সমুদ্রে না থাকলে এর নির্ভুল জবাব পাওয়া যাবে না। শাহ
সাদীক ও তাঁর অনুগামীগণ ইসলামের সংস্কারের জন্যে যে কার্য সম্পাদন
করেন, তার সমাজ শক্তিকে তুলনায় একদিকে এবং অন্যদিকে তার সমকালীন
জাহাজেরদের শক্তিকে স্বাগত করলে তবে পৃথিবী অনুপ্রাণন করা সম্ভব হবে
যে, এ বুজরস্তে যে নীতি-নিয়ম কার্যকারী রয়েছে তার পরিচিতিতে এ দুই
শক্তির অনুপাতিক হার কি ছিল? একথা মেরুদী অভিযোজ্য হবে না যদি
আমি বলি যে, এ দুই শক্তির মধ্যে এক তোলা এ এক মণের সম্পর্ক ছিল।
এজন্য বাদে যে ফলাফল সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে ভিন্নতর কিছু হওয়া
সম্ভবপর ছিল না।

যে যুগে আমাদের দেশে শাহ ওয়ালিউলাহ, শাহ আব্দুল আজিজ ও শাহ
ইসমাইল শহীদ জন্মগ্রহণ করেন, সে যুগেই ইউরোপ নব শক্তি ও নব উদ্ভিডন
নিয়ে মধ্য যুগের নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছিল। সেখানে জান ও শিল্প
অনুষ্ঠানকারী, উদ্ভাবক ও আবিষ্কারক এত বিপুল সংখ্যায় জন্মলাভ করেছিলেন

৩৮. এ কারণেই বর্তমানে সীমান্ত হস্তের হয়ত সাইয়েদ আহমেদ শহীদ ও শাহ ইসমাইল শহীদের
কোনো প্রতার অনেক অনুসারের পার পাওয়া যায় না। এমন কি সেখানকার লোকেরা বর্তমানে
বিভিন্ন উর্দু বইগুলোর মাধ্যমে তাদের নাম জানতে পারছে।
যে, তাঁরা সবাই মিলে এ দুনিয়ার চেহারাই পালটিয়ে দেন। এ যুগেই হিউম, কাল ফিশটে (Fichte), র্সেল, কোইটে (Comet), প্লিয়ার মাষার (Schlier Macher), ও মিন-এর নায় দার্শনিকগণ জন্মগ্রহণ করেন। তারা তর্কশাস্ত্র, দর্শন, মনোভুত এবং যুক্তিবিদ্যার সমগ্র শাখা-প্রশাখায় বিপ্লব সাধন করেন। এ যুগেই শরীর বিদ্যায় গ্যালভানি (Galvani) ও ভল্টা (Volta), রসায়নশাস্ত্রে ল্যাভোসিয়ার (Lavosier), প্রিস্টলি (Priestley), ডেভি (Devy) ও বার্জিলিসার (Berzilivs) এবং জীব বিদ্যায় লিনে (Linne), হ্লার (Haller), বিশাল (Bichat) ও উলফ (Wolf)-এর নায় পণ্ডিতদের আবির্ভাব হয়। তাদের গবেষণা গুলো বিজ্ঞানের উন্নতির সহায়ক হয়নি বরং বিশ্বজাহান ও মানুষের সম্পর্কে একটি নতুন মতবাদেরও জন্য দেয়। এ যুগেই কুইসনে (Quisney), টার্গোট (Turgot), এডমি সিথ (Adam Smith) ও ম্যালথেসের গবেষণার মাধ্যমে নতুন আধশ্চীতি বিজ্ঞানের উদয় হয়। এ যুগেই ফ্লাগে বুশো, ফর্কেনার, মন্টসকা, ডেনিস ডাইডোট (Denis Diderot), লা মাট্রি (La-mattrie), ক্যাবানিস (Cabanis), বোফন (Buffon) ও বোবিনেট (Robinet), ইন্টং ডমাসপোনে (Thomspoune), উইলিয়াম গডউইন (William Godwin), ডেভি হার্টলে (David Hartley), জোসেফ প্রিস্টলে (Joseph-priestly) ও এরাসমাস ডারউইন এবং জার্মানিতে গেটে, হার্টফার্ড, শিলার (Schiler), উইন্কেলম্যান (Winekelmann), লিসিং (Lessing), ও হোল্বাক (Holbach) এবং আরো অনেক গবেষকের জন্য হয়। তাঁরা নৈতিক দর্শন, সাহিত্য, আইন, ধর্ম, রাজনীতি এবং সমাজবিদ্যার সকল শাখায় বিপুল প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁরা নিহিতভাবে অর্থীন মতবাদ ও চিন্তাধারার কঠোর সমালোচনা করে চিন্তার এক নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করেন।

প্রেসের ব্যবহার, প্রচারের আধিক্য, আধুনিক প্রকাশতন্ত্রী ও কঠিন পরিবারের পরিবর্তে সাধারণের বোধগম্যাসা ব্যবহার করার কারণে তাদের চিন্তার ব্যাপক প্রচার হয়। তারা মাত্র তোটিয়ক বাক্যকে নয় বরং বিভিন্ন জাতিকে সমাজের প্রতি প্রভাবিত করেন। পুরাতন মানসিকতা, নৈতিক রূপক ও রীতি-প্রকৃতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, জীবনাদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা এবং তমুদুন ও রাজনীতির সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে তাঁরা আমূল পরিবর্তন করেন।

এ যুগেই ফরাসী বিপুল অনুষ্ঠিত হয়। এর থেকে একটি সমস্তার জন্ম হয়। এ যুগেই যন্ত্রের আধিকারের ফলে শিল্পক্ষেত্রে বিপুল সাধিত হয়। ফলে একটি নতুন তমুদুন, নতুন শক্তি ও নতুন জীবন সমস্যার উদ্ভব হয়। এ যুগেই ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প অসাধারণ উন্নতি লাভ করে। এর ফলে ইউরোপ এমনকি শত্রুর অধিকারী হয়, যা ইতিপূর্বে আর কোনো জাতিতে ছিল না। এ যুগেই
পুরাতন যুদ্ধনীতির প্রচলন হয়, জুযরনাট, নয়া যুদ্ধনীতি, নয়া যুদ্ধ, যুদ্ধপদ্ধতির প্রচলন হয়।

দুর্শীত মাহমুদের মাধ্যমে সৈনিকদের সাংগঠিত করার পদ্ধতি গৃহীত হয়।

এর ফলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈনিকদের নয়া আদেশ হয় এবং পুরাতন

পদ্ধতিতে শিক্ত সেনাদল তাদের মোকাবিলায় তিনটি পাওয়া থাকে। সৈনিকর

ট্রেনিং, সেনাদল বিভাগ ও যুদ্ধ কৌশলের মধ্যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়

এবং প্রতিটি যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে এ শিল্পকালে অনবরত উন্নত করার

প্রচেষ্টা চলতে থাকে। অনবরত আধিকারের মাধ্যমে যুদ্ধনীতির মধ্যে বিরাট

পরিবর্তন সাধিত হয়। রাইফেল আধিকার হয়। হাস্য ও দৃষ্ট বহনকারী

মেশিনগান তৈরি করা হয়, কেল্পা ধারকারী মেশিনগান পূর্বের চাইতে

শক্তিশালী করে তৈরি করা হয় এবং সর্বপর কার্টজের আধিকার নয়া বন্দুকের

মোকাবিলায় পুরানো পাউডার বন্দুককে একবারেরই অক্ষেপ প্রচার করে।

এ কারণেই ইউরোপের ভূক্তীর প্রতি ভারতবর্ষের দেশীয় রাষ্ট্রগুলোকে আধুনিক

পদ্ধতিতে সৃষ্টি করা অনবরত পরাজয় বরণ করতে হয় এবং মুসল্লী জাহানের কেন্দ্রস্থলে হামলাকের

নেপোলিয়ন মুষ্টিমেয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে মিলের দখল করেন।

সম্পর্কে ইতিহাসের পাতায় মোটামুটি একটা দৃষ্টি নিকেতন করলেই

একথা সহজেই পরিষ্কার হয় যে, আমাদের এখানে মাত্র কতিপয় ব্যস্ত্র জাগৃত

হন। এখানে জীবনের কেবলমাত্র একদিকে সামান্য একটি কাজ হয়। কিন্তু

সেখানে জীবনের প্রতিটি দিকে হাজার ও বৈশিষ্ট্য কার্য সম্পন্ন হয়। বরং

জীবনের এমন কেনে দিক ছিল না যেখানে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

এখানে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তাঁর পুরুষ বিশেষ বিশেষ শাখার কেরানী কিতাব

লেখন। তাঁদের এ কিতাবগুলো অত্যন্ত সীমিত পরিবেশে পৌছেই আটকে

থাকে। আর সেখানে প্রতিটি বিদ্যা-শিক্ষার ওপর কিতাব লিখত লাইফের পর

লাইফের ভরা করা হয়। তাঁদের কিতাবমূলী সমগ্র দুঃখিয়া পরিবর্ধন হয়।

অসংখ্য মানুষের মন-মগজের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। এখানে দর্শন,

নৈতিক চরিত্রনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি শাখার ভিত্তিতে

নয়। বৃহদাঙ্ক হাস্যের আলোচনা নেহাত প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে। পরবর্তীকালে

তাঁর ওপর আর কেনে কাজ হয়নি। আর সেখানে ইত্যাদির এর সম্মান

ওপর পূর্ণিমা চিন্দ্রার গঙ্গা গয়ে গড়ে ওঠে। এ চিন্দ্রারা সমগ্র চিত্র পরিবর্তিত করে।

এখানে শরীর বিদ্যা ও ভক্তিশীল সম্পর্কিত বিদ্যা পাঁচা ভাবের নয়।

একই পর্যায়ে অবস্থান করে, আর সেখানে এ ক্ষেত্রে এতবেশী উন্মতি সাধিত

হয় এবং সেই উন্মতির কারণে পাশ্চাত্যবাসীদের শক্তি এত বেড়ে যায় যে,
তাদের মোকাবিলায় পুরাতন যুদ্ধাট্টি ও যুদ্ধাদিকের জোরে সাফল্য লাভ করা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

আচর্জের ব্যাপার হলো এই যে, শাহ ওয়ালিউদ্দৌহর যুগে ইংরেজ বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করেছিল এবং এলাহাবাদ পর্যন্ত তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু শাহ সাহেব এ নয়া উদ্যোগে শক্তির ব্যাপারে কোনো খোঁজ-খবর নেননি। শাহ আবদুল আজীজের যুগে দিল্লীর বাদশাহ ইংরেজদের নিকট থেকে পোশনাত লাভ করতে; আর প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের ওপর ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মনে কথনে এ প্রশ্ন জাগেনি যে, এ জাতিটি কেমন করে এতটা আহসার হচ্ছে এবং এ নয়া শক্তির পেছনে কোনো শক্তি কার্যকরী আছে? সাইয়েদ সাহেব ও শাহ ইসমাইল শহীদ কার্যত ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্য কর্মক্ষেত্রে বাঁচিয়ে পড়েন। তাঁরা যাবতীয় ব্যবস্থা ও আঘোর সম্পন্ন করেন। কিন্তু জীবন ও বিচ্ছদ্রণ আলেমদের একটি দলকে ইউরোপে প্রেরণ করতে পারেননি—যাঁরা সেখানে গিয়ে অনুমোদন চালাতেন যে, কোনো শক্তির জোরে এ জাতিটি তুষারের বেগে আহসার হচ্ছে এবং নয়া উপকরণ, নয়া পদ্ধতি ও নয়া জান-বিজ্ঞানের সাহায্যে অভিনব শক্তি ও উন্নতি লাভ করছে। এর কারণ কি? তাঁরা নিজেদের দেশে কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠান কামের করছে? তাঁরা কোনো ধরনের জান-বিজ্ঞানের অধিকারী কি? তাদের তুম্ভিতে কিসংজ্ঞায় গড়ে উঠছে। এবং তার মোকাবিলায় আমাদের নিকট কোনো জিনিসের অভাব আছে? যখন তাঁরা জিহাদে অবতীর্ণ হন, তখন একথা কারার অবিদ্যমান ছিল না যে, ভারতবর্ষে শিখদের নয় ইংরেজদের শক্তই হলো আসল শক্তি, আর ইংরেজদের বিরোধিতাই ইসলামী বিপ্লবের পথে সচাইতে বড় বিরোধিতা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম ও জাহেলিয়াদের সংযোগে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্যে যে প্রতিবিধূরীর সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার প্রয়োজন ছিল তার মোকাবিলায় নিজের শক্তির পরিমাপ করা এবং নিজের দুর্বলতাসমূহ অনুধাবন করে সেগুলো দূর করার প্রচেষ্টা চালানো উচিত ছিল।

শেষে কথা

পাপন্তর জাহেলিয়াদের মোকাবিলায় ইসলামী। পুনরুজ্বালিতের ব্যাপারে সম্ভবতীয় হয়, যা থেকে আমরা প্রথমতঃ এ শিক্ষা
গ্রহণ করি যে, ইসলামী পুনর্জীবনের জন্যে নিষ্ঠুর দীনি এল্মেকে পুনর্জীবিত ও শরীয়তের প্রাণ শক্তিকে সজ্জীবিত করাই যথেষ্ট নয় বরং একটি ব্যাপক ও বিশ্বজীবী ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজন। এ আন্দোলন সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিত্রা, শিল্প, বাণিজ্য তথা জীবনের সকল বিভাগে নিজের প্রভাব পরিব্যাপ্ত করবে এবং সকল সভ্যতা শক্তিকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করবে। এ থেকে আমরা দ্বিতীয় শিক্ষা লাভ করি এই যে, বর্তমানে তাজদীদের কাজ করার জন্যে নতুন ইজতিহাদী শক্তি প্রয়োজন। শাহ ওয়ারিংলার র(র) ও তাঁর পূর্ববর্তী মুজাদ্দির ও মুজতাহিদগণের কর্মকাণ্ডে যে ইজতিহাদী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় বর্তমানকালের সমস্যা সমাধানের জন্যে নিষ্ঠুর তত্ত্বকুই যথেষ্ট হবে না। আধুনিক জাহেনিয়ার বিপুল উপকরণ সহ আবির্ভূত হয়েছে এবং অসংখ্য জীবন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। শাহ ওয়ারিংলার বা তাঁর পূর্ববর্তীগণের মনে এসব সম্পর্কে কোনো প্রকার ধারণা ছিল না। একমাত্র সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে নবী করিম (স) এ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কাজতে এ যুগে মিরাতের সংস্কারের কাজের জন্যে একমাত্র খোদার কিভাবে ও রসূলের সুন্নাতের উৎস থেকেই নেতৃত্ব গ্রহণ করা যেতে পারে। আর এ নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর বর্তমান অবস্থায় বৃহত্তর কর্মপথ প্রণয়নের জন্যে এমন হতে ইজতিহাদী শক্তির প্রয়োজন, যা পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের কারোর জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা ও পদ্ধতির অনুগত হবে না, অবশ্য তাদের প্রত্যেকের ইজতিহাদ থেকে উপকৃত হবে এবং কাউকে উপেক্ষা করবে না।
পরিশিষ্ট

ইতিপূর্বে পথম সংকলনের (উর্দু) ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, এ কিংবারের সাথে একটি পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়েছে। এ কিংবারের আলোচনায় আমি যেসব প্রশ্নের অবতারণা করেছি সে সম্পর্কে মাঝে মাঝে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তার যে জবাব আমি দিয়েছি, তা এককিত করে পাঠকর্মের সম্প্রস্থাপিত করা এর উদ্দেশ্য। এই বিভিন্ন বিভিন্ন পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় যেসব প্রশ্ন আমার নিকট এসেছে, তা জবাব সহ এখানে উদ্ধৃত করছি। আশা করি, এগুলো অধ্যয়ন করার পর—আর যাঁদের মনে এ ধরনের প্রশ্ন ও সম্প্রদায় আছে—তাদের প্রশ্ন ও সম্প্রদায় নিরসনের জন্যও এগুলো যথেষ্ট কার্যকরী হবে।
তাজীদের প্রকৃতি ও ইমাম মেহদী

প্রশ্ন

'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন' কিংবা যে কত উন্নতমানের আলোচনা সম্পর্কে তা “মুজাদ্দিদের কাজ কি” শিরোনামায় লিখিত প্রবন্ধ ও বিভিন্ন মুজাদ্দিদগণের কার্যক্ষেত্রের বিবরণ থেকে যে কেনা বিচিত্র ব্যক্তি অবশ্যই অনুমান করতে পারবেন। তবে এর কয়েকটি দিক ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

সেগুলো নীচে উল্লেখ করছি।

১. ইমাম গাজ্জালী (র)-এর আলোচনার শেষের দিকে আপনি যে তিনি দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ (ক) হাদিস শাস্ত্রে ইমামের দুর্বলতা, (খ) তাঁর ওপর যুক্তিবাদিত্ব আধিপত্য এবং (গ) তাসাউফ এর দিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত বুকে পড়া। ইমামের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এইহয়াইউল উলুম ও কিমিয়ায়ে সাক্ষাৎ থেকে কি এসবের প্রমাণ পাওয়া যায়? এ কিতাবগুলো তিনি যে তাসাউফ বর্ণনা করেছেন, তা কি ক্রিয়ামুক্ত যা? উপরতুল যুগের মুজাদ্দিদকে কি তাঁর সমকালীন ব্যক্তিবর্গের তুলনায় বেশী পরিমাণ নিভুল জ্ঞান দান করা হয় না? অন্যায়াত্মক সমস্ত যুগে তিনি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন কেন?

২. মুজাদ্দিদে আলফিসানী ও শাহ ওয়ালিউদ্দালাহ সর্পকে আপনি লিখেছেন যে, 'হযরত মুজাদ্দিদে আলফিসানীর যুগ থেকে নিয়ে শাহ ওয়ালিউদ্দালাহ ও তাঁর প্রতিনিধিদের সময় পর্যন্ত যাবতীয় সংস্কারমূলক কাজে যে জিনিসটি প্রথম আমার চোখে দেখেছি, তাহলো এই যে, তা তাসাউফের ব্যাপারে মুসলমানদের রোগ পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারেননি এবং অজানিতভাবে তাঁদেরকে পুনর্বার সেই খাদ্য দান করেন যা থেকে তাদেরকে পূর্বরূপে দুরে রাখার প্রয়োজন ছিল।' হযরত মুজাদ্দিদ ও শাহ সাহেব সর্পকে একথা মনে নেয়া কটন যে, তাদের দৃষ্টি এতে অপরিপক্ক ছিল যার ফলে তাসাউফের ব্যাপারে মুসলমানদের রোগ সর্পকে তাঁরা পুরোপুরি ধারণা করতে পারেননি।

তাঁরা জাগতিক বিদ্যায় সাথে সাথে অধ্যাত্মিক বিদ্যারও (কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে) যথেষ্ট পরামর্শ ছিলেন। তাছাড়া তাঁরা মুজাদ্দিদ হবার দাবীও করেন, একথা মাওলানা আজাদ তাঁর 'তাজকব্রা' উল্লেখ করেছেন। হযরত মুজাদ্দিদ তাঁর প্রতিক্ষেত্রে লিখেছেন যে, নবুয়াতের হাজার বছর পর তিনি মুজাদ্দিদরূপে আগমন করেছেন। এসব কথার পরিশোধিতে স্বাভাবিকভাবে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর হয়।

www.icsbook.info
(ক) হযরত মুজাদ্দিদ ও শাহ সাহেব নিজেদেরকে যে মুজাদ্দিদ বলে ঘোষণা করেন, তাদের এ ঘোষণা কি খোদার নির্দেশানুসারী ছিল না? উপরন্তু তাদের রচনাবলীতে যে কাশফ ও ইলহামের উল্লেখ আছে তাঁর তাত্ত্বিক কি? তারা শরীয়ের আইন অনুযায়ী মুজাদ্দিদ হন, না প্রাক্তন আইন অনুযায়ী?

(খ) এ ধারণা কি সত্য যে, মুজাদ্দিদ অবশ্য তাঁর জামানার বিশিষ্ট ব্যক্তি হন? তিনি শ্রেষ্ঠতম শরীয়তবিদ ও দীনি তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হন? এবং এ সংগে তিনি খোদার নিকটতম ব্যক্তি হন? অন্যথায় আর সবাইকে বাদ দিয়ে একমাত্র তাঁকে এই বিরাট কার্য সম্পাদনের জন্য নির্বাচিত করা হয় কেন?

(গ) ‘মুবাশ্শিরাত’-সুসংবাদসমূহের তাত্ত্বিক কি?

(ঘ) প্রতি শতকের অপ্রত্যাশিতে একজন করে মুজাদ্দিদের আগমন হবে, এ হাদিস কি সত্য নয়? আর নিজের মুজাদ্দিদ হওয়া সম্পর্কে কি তিনি অবগত থাকবেন না? এটা কি তার জন্য জরুরী নয়?

৩. ইমাম মেহদী সম্পর্কে আপনি লিখেছেন যে, তিনি সাধারণ আলোকণের বর্ণনা থেকে অনেক ভিন্ন ধরনের হবেন। অথচ আলোকণের নিকট শনি যে, ইমামের নাম ও বংশ ছাড়াও আরো ভিন্ন আলামত হাদিসে উল্লিখিত আছে। তিনি বিশেষ পরিবেশ বিশেষ আলামতসহ আবিষ্কৃত হবেন। লোকেরা তাঁকে চিনে ফেলবে এবং জেরপূর্বক তাঁর হাতে বাইয়াত হয়ে তাঁকে শাসক নিযুক্ত করবে। আর ইতিবাচক আস্মান থেকে-আওয়াজ আসবে যে, ইনি আলমাহর খ্লীফা ইমাম মেহদী। কিন্তু আপনি বলছেন যে, “দাবীর মাধ্যমে কার্যান্তরের পরামর্শক নবী ছাড়া আর কারো নেই এবং নবী ছাড়া আর কেউ ইনিও নিচুত হয়ে আসবেন যে, তিনি কোন খেলামতে নিযুক্ত হয়নি। মেহদীবাদ নবীর কারণ জিনিস নয়, কাজ করে দেখিয়ে দিয়ে যাবার জিনিস। এ ধরনের নবীর যারা করেন আর যারা তাঁর উপর ইমাম আনেন, আমার মত তাঁর উভয়ই নিজেদের জানার উন্নতি ও নিজস্ব মানসিকতার পরিচয় দেন।”

আমার প্রশ্ন হলো উপরন্তু উল্লিখিত আলামত ও অবস্থা বহু আলেম (যেমন মাওলানা আশরাফ আলী খানের বই বেহেশ্তী জেওয়া দেখুন বর্ণনা করেছেন। তাদের এ বর্ণনাবলী কি নির্ভুল হাদিস ভিত্তিক নয়? যদি হয়ে থাকে, তাহলে আপনার বর্ণনার পেছনে কি যুক্তি আছে?

জবাব

আপনার প্রশ্নাবলীর জবাব দেবার পরিবর্তে আমি কতিপয় বিষয়ের ব্যাখ্যা করা জরুরী মনে করি, যেগুলো হয়ে আসে করার পর আপনার বিভিন্ন ধ্রুপের জবাব পেয়ে যাবেন।
এক ৪ আমাদের নিকট এমন কোনো উপায়-উপকরণ নেই, যার মাধ্যমে আমরা নিচ্ছতা সহকারে একথা বলতে পারি যে, অমূক ব্যক্তি মুজাদ্দিদ ছিল আর অমূক ছিল না। কোনো ব্যক্তির কর্মকাণ্ডে প্রভাব করে পরমাণু রূপের লোকারা বা তাঁর সমকালীন জনসমাজ তাঁর মুজাদ্দিদ হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কে রায় কায়েম করে এসেছে। আগের বহুলক সম্পর্কে আলেম সমাজ এ রায় রাখেন যে, তাঁরা মুজাদ্দিদ ছিলেন। কিন্তু আমার অনেকে তাঁদেরকে মুজাদ্দিদ বলে সন্ন্যাসীর করেননি। তাদের করার সাথে কোনো আলামতও নেই যার সাহায্যে তাঁদের মর্যাদা নিধ্বনীকরণ করা যেতে পারে।

দুই ৪ তাজদীদ কোনো দীনি মর্যাদার নাম নয়। কাজেই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কোনো ব্যক্তির শরীয়তের আইন অনুযায়ী মুজাদ্দিদ হবার প্রশ্নই নেই এবং তাঁকে মুজাদ্দিদ বলে সন্ন্যাসীর করা না করার ফলে কোনো ব্যক্তির দীনি আদিমের ওপর তালা-মন্দ প্রভাব পড়ে না। এটি একটি পদমর্যাদা। কোনো ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের প্রভৃতিতেই তাঁকে এ পদমর্যাদা দান করা হয়। কোনো ব্যক্তি দীনকে পুনর্মিতিত করার জন্যে যে কোনো পর্যায়ের কোনো কার্য সম্পাদন করেন তাঁকে মুজাদ্দিদ বলা যেতে পারে। অবশ্য অন্য কারণের মতে ঐ ব্যক্তির কার্যটি যদি উল্লেখিত মর্যাদার অধিকারী না হয়, তাহলে তিনি তাঁর মুজাদ্দিদের মর্যাদা অধীনীর করতে পারেন। অবিভক্ত লোকারা এ বিষয়টিকে অনর্থক গ্রন্থপূর্ণ বাণিজ্য দিয়েছে। নবী করিম (স) যে খবর দিয়েছিলেন, তা শুধু একটুকুই ছিল মে, আল্লাহ তায়ালা এ দীনকে বিলুপ্ত হতে দেবেন না বরং প্রত্যেক শতকের অগ্রভাগে এমন এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের আবির্ভাব ঘটবে যিনি বা যারা ইসলামের অস্পষ্ট চিত্তগুলোকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। হাদিসে “মান” শব্দটি আরবীতে কেবল এক ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এর অর্থ বহু ব্যক্তিও হয়। এ হাদিসে এমন কোনো শব্দ নেই যা অর্থে এ দাড়ায় যে, মুজাদ্দিদকে নিজের মুজাদ্দিদ হওয়া সম্পর্কে সজ্জানি থাকতে হবে অথবা লোকদের জন্যে তাঁকে মুজাদ্দিদ বলে চিনে নেয়া জরুরী হবে।

তিন ৪ কোনো ব্যক্তির মুজাদ্দিদ হবার অর্থ এ নয় যে, তিনি সবগিদ দিয়ে একজন ‘মরদে কামেল’—আদর্শ ব্যক্তি এবং তাঁর কর্মচারী দৌড়-কৃতি মুকু। তাকে মুজাদ্দিদ মেনে নেবার জন্যে কেবল তাঁর সামর্থবাণীর এ সাক্ষ্যাদানই যথেষ্ট যে, তা সংক্রামক। কিন্তু কাউকে মুজাদ্দিদ বলে মেনে নেবার পর তাঁকে নির্দোষ ও নিপ্পাপ মনে করলে এবং তাঁর প্রত্যেকটি কথার ওপর ইমাম আলোকে আমাদের বিরাট ভূল হবে। নবীর নয় মুজাদ্দিদ নিপ্পাপ হন না।
চার ৪ উমতের মুজাদ্দিদগণের কার্যকলাপের ওপর আমি যে মন্তব্য করেছি তা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আমার যে কোনো মতের সাথে বিরোধ করার অধিকার প্রভুক্ত ব্যক্তির আছে। আমি যেসব যুক্তির ভিত্তিতে কোনো মত প্রকাশ করেছি তার ওপর যদি আপনি নিষ্ঠিত হন তো ভালই; আর যদি নিষ্ঠিত না হন, তাহলেও কিছু আসে যায় না। তবে আমি এতেকুল অবশ্যই চাই যে, যুক্তি ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতে কোনো মতকে বর্জন বা গ্রহণ করবেন—বৃষ্টি পৃথিবীর প্রবণতায় প্রভাবিত হয়ে নয়।

পঁচ: বিগত জামানায় কোনো কোনো মনীষী অবশ্যই অন্যের নিজেদের সম্পর্কে কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে এ খবর দেন যে, তাঁরা নিজেদের জামানায় মুজাদ্দিদ। কিন্তু তাঁরা অর্থে কোনো দাবী করেননি যে, তাঁদেরকে মুজাদ্দিদ মনে নেয়া লোকদের জন্যে জতনী এবং যে তাঁদেরকে বীরকার করবে না সে গোমরাহ। দাবী করে তা বীরকার করার জন্যে আমার জানানো এবং তা বীরকার করিয়ে নেবার চেষ্টা করা আলো কোনো মুজাদ্দিদের কাজ নয়। যদিও এ কাজ করেন, তবে নিজেই তাঁর এ কাজ থেকে প্রমাণ করেন যে, তিনি আসলে মুজাদ্দিদ নন।

ছয়: কাশফ ও ইলহাম ওহির ন্যায় কোনো নিষ্ঠিত জিনিস নয়। তার মধ্যে এমন কোনো অবস্থা হয় না, যার ফলে যে ব্যক্তির কাশফ হয়, তিনি উজ্জল দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট প্রত্যয় করতে পারেন যে, এ কাশফ বা ইলহাম খোদার পক্ষ থেকে হচ্ছে, এর মধ্যে কমবেশি বিভাগিত অর্বকাশ আছে। এজন্যই আলেমগণ একথা বীরকার করেন যে, কাশফ ও ইলহামের সাহায্যে শরীয়তের কোনো বিধান প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হয় না। এবং এই উপায়ে লন্ধনজন দলিল নয় এবং যে ব্যক্তির কাশফ হয় তার জন্যেও খোদার কিছু ওরসুলের সুনামের মানদণ্ডে যাঁচাই না করে কোনো কাশফ ও ইলহাম লন্ধন বুঝে আনুগত্য করা জায়ের নয়।

সাত: ইমাম মেহদী সম্পর্কে আমি এখানে যা কিছু লিখিয়েছি আমার বিভাব ‘রাস্তায়ল ও মসায়লে’ সে সম্পর্কে এর চাইতেও বিস্তারিত আলোচনা করেছি ৩৯ মেহরবানী করে এসব আলোচনা দেখুন। এ থেকে আপনি জানতে পারবেন যে, রুপরূপ হাদীসগুলোর ব্যাপারে আলেমগণ যে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন সে সম্পর্কে আমি কি অনুসন্ধান চালিয়েছি। আমি ঐ সকল আলেমকে আত্মীয় শ্রদ্ধা করি; কিন্তু কোনো আলেমের প্রতীকটি কথা মনে নেবার অভ্যাস আমার নেই।

(তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১)

৩৯. এ বৃহৎের ১৬১ থেকে ১৭২ পৃথক প্রত্যক্ষ এ আলোচনা দেখুন।
কাশফ ও ইলহামের তাত্পর্য এবং
কতিপয় মুজাহিদদের দাবী

প্রশ্ন

আপনার তর্জমানুল কুরআন পত্রিকার ১৯৫১ সালের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় এক প্রশ্নের জবাবে লিখিত যে, “বিগত মুগ্ধের কতিপয় বুদ্ধি নিজেদের সম্পর্কে কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে এ খবর দেন যে, তাঁরা নিজেদের জামানার মুজাহিদ। কিন্তু এ অর্থে কেনো দাবী করেননি যে, তাঁদেরকে স্বীকার করে নেয়া লোকদের জন্যে জরুরী এবং যে তাঁদেরকে স্বীকার করবে না সে গোমরাহ।” আপনার একথা সত্য মনে হয় না। কেননা হয়ত শাহ ওয়ালীউদ্দৌলাহ (র) অনায়াসে দাবী করে বসেছেন যে, ‘আমাকে আল্লাহ তায়ালা জানিয়েছেন যে, তুমি এ জমানার ইমাম। লোকদের তোমার অনুসরণে নাজাতের উপায় মনে করা উচিত।’ উদাহরণ ধরে তাফসীরেতে ইলাহিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা দেখুন। হয়ত শাহ সাহেবের এ দাবী সত্য ছিল কিনা। যদি তাঁর দাবী সত্য হয়, তাহলে আপনার একথা সত্য নয়, যা আপনি উপরের প্রতিকালের পর লিখিত যে.python

“দাবী করে তাকে স্বীকার করে নেয়ার জন্য আহ্বান জানানো এবং তাকে স্বীকার করার চেষ্টা করা আদৌ কেনো মুজাহিদদের কাজ নয়।” আবার আপনি উপরের প্রতিকালের বাক্যের পর লিখিত যে; “যে ব্যক্তি এ কাজ করে সে নিজেই নিজের কাজ থেকে একথা প্রমাণ করে যে, সে আসলে মুজাহিদ নয়।”

আপনার এ কথাগুলোর ভিত্তি কি? কুরআন মজাজী, নবী কর্মীর হাদিস, না আপনি নিজের ইজতিহাদের ভিত্তিতে এ ফতোয়া দিয়েছেন? একই পত্রিকার একই পৃষ্ঠায় স্থান নতুনে আপনি লিখিতে।

“কাশফ ও ইলহাম ওহির ন্যায় কেনো নিষ্ঠিত জিনিস নয়। তার মধ্যে এমন কেনো অবহ্ষা হয় না, যার ফলে যে ব্যক্তির কাশফ হয়, তিনি উঞ্জুল দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারেন যে, এ কাশফ বা ইলহাম খোদার পক্ষ থেকে হচ্ছে।”
আপনার একথাও আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলছেন, না
এটাও আপনার ইতিহাস? অথবা কুরআন মজীদ বা রসূলের হাদীসের
ভিত্তিতে একথা বলছেন?

মুসলিম জাতির কামেল ব্যক্তিগণের কাশফ ও ইলহামের অবস্থা যদি এই
হয় থাকে, তাহলে তারা যে উভয় জাতি তাই বা দশ কি? অথচ পূর্ববর্তী
উখ্যাতগণের মধ্যে মহিলাও খোদার ওহি লিখ করতেন। আবার খোদার এমন
বান্ধার ছিলেন যাদের কাশফ ও ইলহাম এমন উন্নত পর্যায়ের ছিল যে একজন
মহানবীকেও প্রশ্ন করে লঘিত হতে হয়। কিন্তু সুবহানাল্লাহ! মুহাম্মদ (স)-
এর উমরের কামেল ব্যক্তিগণের কাশফ ও ইলহাম এমন অন্তর্ভ ধরনের ছিল
যে, এসব আল্লাহ তায়লার পক্ষ থেকে কিনা এ সমর্পিত তারা নিজেদেরকে
জানতেন না। তাহলে যে সমস্ত কাশফ ও ইলহামে দীনের কোনো লাই ছিল না
এবং যাদের ওপর এসব অবতার হতো তাদের ঈমান যখন এর ফলে বৃদ্ধি
হোতা না বরং স্বয়ংনির্ভূ হবার কারণে এগুলো এক ধরনের আপদ ছিল তখন
তাদের ওপর সে সমস্ত কাশফ ও ইলহাম অবতার করার আল্লাহ তায়লার কি
প্রয়োজন ছিল?

জবাব

ওহি ও ইলহামের বিভিন্ন অর্থ সংমিশ্রিত করে আপনি ভুল করছেন। এক
ধরনের ওহি আছে যাকে ‘জিজিল’ বা প্রাকৃতিক ওহি বলা হয়। এর মাধ্যমে
আল্লাহ তায়লা প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে তার কর্তা শিক্ষা দেন। এ ওহি মানুষের
তুলনায় জনোয়ারদের ওপর এবং সম্ভাব্যতা তার তুলনায় উল্লিখিত এ জড় পদার্থের
ওপরই বেশী অবতার হয়। দ্বিতীয় ধরনের ওহিকে বলা হয় আঘাতের ওহি। এ
ওহির মাধ্যমে কোনো বিশেষ সময় আল্লাহ তায়লা কোনো বান্ধকে জীবন
সমস্যার মধ্য থেকে কোনো এক সমস্যা সম্পর্কে কোনো জন, কোনো
হেদায়েত অথবা কোনো কৌশল শিক্ষা দান করেন। এ ওহি সাধারণ মানুষের
ওপর প্রায়শই অবতার হয়। ওহির বদৌলতেই দুনিয়ার বড় বড় আবিষ্কারসমূহ
সাধিত হয়েছে। বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের ঘটনা এর মাধ্যমে সম্পর্ক হয়েছে।
বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যে এর শক্তি সতর্ক দেখা যায়।
কোনো বিশেষ সময় কোনো প্রকার চিত্তা-ভাবনা ছাড়াই হঠাৎ এক ব্যক্তির
মনে একটি চিত্তার উদয় হয় এবং তার মাধ্যমে তিনি ইতিহাসের গতিধারার
ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেন। হযরত মূসা (খ)-এর মাতার ওপর এ
ধরনের ওহি অবতার হয়েছে। এ দুই ধরনের ওহি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক আর
এক ধরনের ওহি আছে যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়লা নিজের কোনো বান্ধকে
অদৃশ্য বিষয়াবলী সম্পর্কে অবগত করান, তাকে জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দেশ

www.icsbook.info
দান করেন, যাতে করে তিনি সেই জ্ঞান ও নির্দেশকে সাধারণ মানুষের নিকট পৌছাতে পারেন এবং তাদেরকে অবশ্য থেকে বের করে আলোকের রাজ্যে প্রবেশ করাতে সক্ষম হন। এ বিষয়ে একমাত্র নবীদের ওপর অবতীর্ণ হয়। কুরআন থেকে পরিকার জানা যায় যে, এ ধরনের জ্ঞান—তাকে ‘এলকা’, ‘কাশফ’ বা ‘ইলহাম’ যাই বলা হোক না কেন অথবা পারিভাষিক অর্থে তাকে ‘ওহী’ আখ্যায়িত করা হলেও তা একমাত্র রসূল ও নবী ছাড়া কারোর ওপর অবতীর্ণ হয় না। উপরন্তু এ জ্ঞান নবীদেরকে এমনভাবে দান করা হয়, যার ফলে এটি যে খোদা প্রদত্ত, শয়তানের অনুপ্রবেশমুক্ত এবং নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা, ধারণা, ইচ্ছা ও বাসনার ছিটকে টাও এর মধ্যে নেই, সে সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস ও নিশ্চয়তা লাভ করা হয়। এ জানাই শরীয়তের দলিল ও প্রমাণ স্বরূপ এবং এর অনুসরণ প্রায়শই ব্যক্তির ওপর ফরজ। এ জ্ঞান অন্য মানুষের নিকট পৌছানো এবং এর ওপর ঈমান আনার জন্যে খোদার সকল বাণীর প্রতি আহ্বান জানানার উদ্দেশ্যেই নির্বাগ নিযুক্ত হন।

নবী ছাড়া অন্য কোনো মানুষ যদি কখনও এ তৃতীয় শ্রেণীর জ্ঞান লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন, তাহলে তা এতেই আবালা ও স্বপ্নে ইশারার পর্যায়ে থাকে যে, তাকে যথাযথতায় বুঝাতে হবে তার নবীর ওপর অবতীর্ণ ওহির আলোকের সাহায্য প্রাপ্ত করার অপরিহার্য হয়ে পড়ে (অর্থাৎ কুরআন ও সূনারের মানদণ্ডে তার সত্য-মিথ্যা যাঁইচাই করা এবং সত্য হল তার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা)। এছাড়া যে ব্যক্তি তার ইলহামকে হেদায়েতের ব্যতিক্রম মাধ্যম মনে করে এবং নবীর ওপর অবতীর্ণ ওহির মানদণ্ডে যাঁইচাই না করেই তাকে কার্যকরী করে এবং অন্যকেও তার অনুসরণ করার জন্যে আহ্বান জানায়, তার অবস্থা সরকারী টাকাশালের মোকাবিলায় নিজের টাকাশাল চালুকারী জাল মুদ্রা প্রতিষ্ঠকরীর নায়। তার এ কার্যই প্রমাণ করে যে, আসলে খোদার পক্ষ থেকে তার নিকট ইলহাম হয়নি।

এ পর্যন্ত আমি যা কিছু বললাম, কুরআনের বিভিন্ন স্তানে একথাগুলো সূপষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষ করে সূরা ‘জ্ঞান”-এর আয়াতে এ বিষয়টিকে একেবারে দ্বিতীয়তার বর্ণনা করা হয়েছে:৪

৪. তাঁর তালিফের ফলে তা প্রকাশ হয়েছে বিষয়ে এমন কিছুর প্রতি যাঁরা আর্থিকভাবে বিনা ভুলে দিয়ে ও কিছু কিছু নিঃক্ষেপ করে তাদের হাতে আসবে তা তাদের এমন কিছু নিঃক্ষেপ করে তাদের হাতে আসবে তা (জন্ম:২৮)
আপনি যদি একথাটি বুঝবার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনি নিজেই জানতে পারবেন যে, উমতের সং ও সংশোধন কার্যে লিঙ্গ ব্যক্তিগত নবীর ন্যায় কাশফ ও ইলহাম দান না করার কারণ কি? প্রথম জিনিসটি আল্লাহ তায়ালাএ জন্যে দান করেননি যে, নবী ও উমতের মধ্যে এরি ভিত্তিতে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই একে কেমন করে দূর করা যেতে পারে। আর দ্বিতীয় জিনিসটি দেবার কারণ হলো এই যে, নবীর পর যেসব লোক তার কার্যাবলীকে জারিরাখার চেষ্টা করেন, তারা ইসলামী বিধানাবলীর মধ্যে গভীর অন্তর্ভুক্তি ও ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য খোদার পক্ষ থেকে সঠিক নেতৃত্বের মুখপেছন হন। এ জিনিসটি অবচেতনভাবে প্রত্যেক আত্মরক্তসম্পন্ন ও নির্জুল চিন্তা সমর্থিত ইসলাম সেবীকে দান করা হয়। কিন্তু যদি কাউকে সচেতনভাবে দান করা হয়, তাহলে সেটা খোদার পক্ষ থেকে পুরস্কার বরং।

আপনার দ্বিতীয় মৌলিক ক্রটি হলো এই যে, আপনি নবী ও অ-নবীর মর্যাদার নীতিগত পার্থক্যকে আদৌ বুঝেননি। কুরআনের পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র নবীই এ মর্যাদার অধিকারী যে, তিনি শরীয়তের বিধান অনুযায়ী খোদার পক্ষ থেকে নিযুক্ত হন এবং একমাত্র তিনিই মানুষকে তাঁর ওপর ঈমান আনার ও তাঁর আনুগত্য কর্তৃক করার জন্যে আহ্বান করার অধিকার রাখেন। এমন কিন্তু যে তাঁর ওপর ঈমান আনার না সে খোদাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও কাফের হয়ে যায়। দীনী ব্যবস্থায় নবী ছাড়া আর কেউ এ মর্যাদার অধিকারী নয়। যদি কেউ এ মর্যাদার দাবীদার হয়, তাহলে আমরা তাঁর দাবীর বিপক্ষে প্রমাণ পেশ করবার না বরং তাকে নিজের দাবীর স্পর্শে প্রমাণ পেশ করা উচিত। তাকে অবশ্যই বলতে হবে যে, কুরআন ও হাদিসের কোথায় নবী ছাড়া অন্য কাউকে এ অধিকার দান করা হয়েছে যে, তিনি মানুষের সমুখে তাঁর এই পদে প্রতিষ্ঠিত হবার দাবী করবেন এবং এ দাবী মেনে নেয়ার জন্যে মানুষকে আহ্বান জানাবেন? তাছাড়া যে এই দাবী স্বীকার করবে না, তাঁ নিষ্ঠাবান দাবীদারের দাবীকে স্বীকার করবে না দাবীর কারণে জাহানারামী ও কাফের হয়ে যাবে, একথাও অবশ্যই তাকে প্রমাণ করতে হবে।

এর জবাব যদি কেউ মেনে নেবে-এর বরত দেন অথবা মেহদীর আগমন সম্পর্কিত হাদিসগুলো পেশ করেন তাহলে আমি বলবো যে, সেখানে কোথাও মুজাদ্দিদ যা মেহদীকে উপরের স্বরূপিত অধিকার দান করা হয়নি। সেখানে কি একথা লেখা আছে যে, তাঁরা নিজেদেরকে মুজাদ্দিদ বা মেহদী বলে দাবী করেন আর যারা সে দাবী মানে একমাত্র তাঁরাই মুসলমান থাকবে আর বাকী সবাই কাফের হয়ে যাবে?
উপরতু এর জবাবে একথা বলাও অসংগত যে, যে ব্যক্তি দীনের 
পুনর্জীবন ও স্বীকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন,
তাঁর সাথে সহযোগিতা না করে তাঁর বিরোধিতা করা নাজাতের কারণ হতে 
পারে না। এতে সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের কাজ হামেশা হক ও বাতিলের 
মধ্যে পার্থক্যকারি পরিণত হয়। এ কাজের সহযোগী হওয়াই মানুষের হক 
পরামর্শ ব্যবস্থা ও পরস্পর 
তবে এ নির্দিষ্টি তিনিতে এ পার্থক্য সৃষ্টি হয় যে, দীনের 
পুনর্জীবন ও দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালানো প্রতীকৃত মুসলমানের 
ওপর ফজর। কিন্তু কোনো দাবীদারের দাবীকে স্বীকার করে নেয়া যে ঈমানের 
দাবী এবং নিজের এক ব্যক্তির মুজাদ্দিদ অথবা মেহদী হবার দাবী স্বীকার না 
করা হলেই নাজাত থেকে বর্ধিত হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই।

এবার শাহ ওয়ালিউদ্দৌলা (র) ও মুজাদ্দিদে আলফিসানী (র) এর দাবীর 
আলোচনায় আসা যাক। আমি এজন্য মতের নিষিদ্ধ যে, পূর্ববর্তী মনীবীদেরকে 
আমি নিষ্পাপ মনে করি না, তাদের নির্দূর কাজকে নির্দূর বলার সাথে সাথে 
তাদের ভূমিকাটিকেই তুলি বলে থাকি। আমার আশংকা, এ ব্যাপারের যদি কিছু 
দার্শনিক আলোচনা করে, তাহলে আমার পরাধুলোর মধ্যে আরো একটি 
অপরাধের সংখ্যা বেড়ে যাবে। কিন্তু দুনিয়ার মানুষের চাইতে খোদাকে অধিক 
ভয় করা উচিত। তাই যে যা বলো না কেন, আমি অবিশ্ব একথা না বলে 
থাকতে পারি না যে, নিজেদের সম্পর্কে এ উভয় মনীবীর মুজাদ্দিদ 
দাবী এবং 
নিজেদের বজ্রাক্ষে বার বার কাশফ ও ইলহামের বরাত দিয়ে 
পেশ করা 
তাদের অন্যতম ক্রটি। আর তাদের এ ক্রটি পরবর্তীকালে বহু দু:দ্রশন দাবী 
ব্যক্তি বিভিন্ন দাবী করার ও উদ্ধোতের মধ্যে নতুন ফিতনা সৃষ্টি করার সাহস 
জাগিয়েছে। কোনো ব্যক্তি ইসলামী পুনর্জীবনের জন্যে যদি কোনো কার্য 
সম্পাদন করার সুযোগ লাভ করে, তাহলে তার তা সম্পাদন করা উচিত, 
অতএব খোদার নিকট তার কি মর্যাদা হবে, সে বিষয়টির সিদ্ধান্ত খোদার ওপর 
ছেড়ে দেয়া উচিত। আল্লাহ তায়ালা মানুষের নিয়ত ও কার্যের পরিকল্পনায় 
এবং নিজের মেহেরবানীতে সেগুলো কবর করে আখ্রাতে মানুষকে যে মর্যাদা 
দান করেন, সেটি মানুষের আসল মর্যাদা। মানুষ নিজে যে মর্যাদা দাবী করে 
অথবা লোকেরা তাকে যে মর্যাদা দান করে সেটি তার আসল মর্যাদা নয়। 
নিজের জন্যে নিজেই উপাধি ও পদবী নির্মাণ করা, দাবী সহকারে সেগুলো 
বিবৃত করা এবং নিজ মুখে নিজের মর্যাদার কথা খোঁজনার কারণে সেগুলো ভালো 
কাজ নয়। পরবর্তীকালে সুফী সুলতান মনোভাব ও রুচি এ জিনিসটিকে বরদাশ্ত 
করে নেয় এবং একে চমৎকারিত্ব দান করে। এমন কি মহান ব্যক্তিদের এ বিষয়টির মধ্যে একটু গল্প দেখতে পাননি। কিন্তু সাহাবায় কেরাম, তাবেইন,
তাব্দে-তাব্দেইন ও মুজাদ্দিদ ইমামগণের আমলে এর অস্তিত্ত্ব ছিল না। আমি শাহ সাহেব ও মুজাদ্দিদ সাহেবের কার্যকে অত্যন্ত সম্মান করি এবং তাদের কোনো ভক্তের চাইতে আমি তাদেরকে কম শ্রদ্ধা করি না। কিন্তু তাদের যেসব কার্যক্ষম আমি বুঝতে অক্ষম হয়েছি, তার মধ্যে এটি অন্যতম। আর সত্যি বলতে কি তারা কাশফ ও ইলহামের বরাত দিয়ে তাদের কথা পেশ করেন, নিচু এজন্য আমি কখনো তাদের কোনো কথা স্বীকার করি। বরং যখনই স্বীকার করেছি, একমাত্র এজন্য স্বীকার করেছি যে, তার পেছনে শক্তিশালী প্রমাণ আছে অথবা যুক্তি ও তথ্যের দিক দিয়ে কথাটি সত্য মনে হয়। অনুরূপভাবে আমি যে তাদেরকে মুজাদ্দিদ মেনে নিয়েছি, এটিও আমার জ্ঞান অভিমত। তাদের কার্যক্ষম প্রত্যাখ্য করে আমি বিক্ষিপ্ততাবে এ রায় কারেম করেছি। তাদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে এটিকে একটি আকিদা হিসেবে আমি গ্রহণ করি।
তাসাউফ ও শায়খকে ধ্যান করা

প্রশ্ন

আমি পরিপূর্ণ আত্মরক্ষা ও বিষণ্নতার সাথে আপনার দাওয়াত অধ্যয়ন করেছি। সলফি (চার ইমামের মহাবের অনুসারী নয়) হওয়া সত্ত্বেও আমি নিজেকে আপনার ইসলামী আন্দোলনের একজন নগণ্য খাদেম ও সমর্থক মনে করি। এবং আমার সাধারণত এ আন্দোলনকে পরিবাদিত করার জন্যও চ্যালেঞ্জ চালাই। সন্দেহ তাসাউফ ও শায়খের ধ্যানে মন্ত্র হওয়া সম্পর্কে কৃতির বিষয় আমার মনে নানান প্রশ্নের অতিশয় করছে। আপনি আমাকে বলিয়েছেন যে, আমার হয়ে না-খাতা যদি আমার কোনো বেদানাতে বিশ্বাস করেন, তাহলে আমার তত্ত্ব ও দাওয়া মন্ত্র সম্পর্কে এ আন্দোলনের মধ্যে অনুভূতি করার সুযোগ দেয়। মেহেরাব্নী করে আমার একখানা মন্ত্র চিত্ত করে কৃপাক ও সুখাহার আলোকে তাসাউফ ও শায়খের ধ্যানে মন্ত্র হওয়া সম্পর্কে আপনার মতামত কি এবং এ ব্যাপারে আসল প্রশ্ন বা কি, তা জানান। আশা করি, তর্কমানুল কুরআনকে বিস্তারিতভাবে বিষয়টি আলোচনা করবেন।

জবাব

আমার কোনো একটি বাক্য থেকে আপনার মনে যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে, তা কোনো সৃষ্টি হতে না, যদি আপনি এ প্রসংগে আমার অন্যান্য স্পষ্ট রচনাবলীও পাঠ করেন। যাহোক তবুও আমি আপনার প্রশ্নগুলোর স্পষ্টত ও সংস্কিত জবাব দিচ্ছি।

১. তাসাউফ কোনো একটি জিনিসের নাম নয় বরং অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস এ নামে আখ্যায়িত হয়েছে। আমরা যে তাসাউফের সততা স্বীকার করি, সেটি এক জিনিস আর যার প্রতি করি সেটি অন্য জিনিস। আবার যে তাসাউফের আমরা সংশোধন চাই, সেটি এ দুটি থেকে ভিন্নতর অন্য এক জিনিস।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের সুফীগণের মধ্যে এক ধরনের তাসাউফের অন্তিম পাওয়া যায়। যেমন মুসা বিন ইয়াজ (র), ইবরাহীম আদহাম (র), মারুফ কারখী (র)-এর কোনো পৃথক দর্শন ছিল না, কোনো পৃথক পদ্ধতি ছিল

www.icsbook.info
না। তাদের চিন্তা ও কর্ম কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ছিল। আর কুরআনের উদ্দেশ্যই ছিল তাদের ঐশ্বরিক চিন্তা ও কর্মের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ খোদাকে কেন্দ্র করতে এবং একমাত্র খোদার জন্যে।

وَمَا أُمِّرُوا إِلَّا لِيُعْبَدُوا اللهُ مَخْلُوصًا لَهُ الدِّينُ حَنْفَىً

আমরা এ তাসাউফকের সত্যতা স্বীকার করি। শুধু সত্যতা স্বীকারই করি না বরং তাকে জীবন ও পরিবারকে করতে চাই।

দ্বিতীয় ধরনের তাসাউফের মধ্যে বীরী দর্শন, বৈরাগ্যবাদ, জরুরিত্ববাদ ও বেদান্ত দর্শনের মিশ্রণ ঘটেছে। এতে খুঁটিনাট ও হিন্দু যোগীদের পদ্ধতি শামিল হয়ে গেছে। শেরক মিশ্রিত চিন্তা ও কর্ম এর সাথে সংমিশ্রিত হয়েছে। শীর্ষত, তীর্থ ও মারফত এসবে পৃথক পৃথক বিষয়। তাদের প্রধান সম্পর্কের মধ্যে কর্মবাদ সম্পর্ক ছিল হয়েছে বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা প্রধান সম্পর্কের বিপরীত ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব মানুষকে পৃথিবীতে খোদার খালিফার দায়িত্ব সম্পাদনকারী হিসেবে তৈরি করার পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন কাজের জন্যে তৈরি করা হয়। আমরা এ তাসাউফকের বিরোধিতা করি। আমাদের নিকট এ বিলুপ্ত করা খোদার দীন কায়েম করার জন্যে আধুনিক জাহেলিয়াহের বিলুপ্তির নায় সম্পর্কের জুর্মী বিষয়।

এ দুটি ছাড়া তৃতীয় এক ধরনের তাসাউফ আছে। এতে প্রথম ধরনের তাসাউফের কিছু অংশ এবং দ্বিতীয় ধরনের তাসাউফের কিছু অংশ সংমিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই তাসাউফের পদ্ধতিসমূহ এমন কর্তিপয় মনোভাব প্রণয়ন করেন, যারা আলম ও সদিক্ষা সম্পন্ন ছিলেন কিন্তু নিজের যুগের প্রধান বিষয়সমূহ ও পূর্বনির্দিষ্ট যুগের প্রভাব থেকে পুরোপুরি সংরক্ষিত ছিলেন না। তারা ইসলামের আসন তাসাউফকে বুঝাবার এবং তার পদ্ধতিসমূহকে জাহেলি তাসাউফের মিশ্রণ মুক্ত করার জন্যে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালান কিন্তু এসব সত্ত্বে তাদের মতবাদে জাহেলি তাসাউফের কিছু না কিছু প্রভাব এবং তাদের কার্যাবলীতে বিহীর কার্যাবলীর কিছু না কিছু প্রভাব রয়ে গেছে। এ সম্পর্কে তাদের মনে এ ধারণা জন্যে, এগোলা কুরআন ও সুন্নাহের শিক্ষা বিষয়কি নয় অথবা কমপক্ষে ব্যাখ্যার মাধ্যমে এগোলকে বিভাগিত মনে করা যেতে পারে। উপরের এ তাসাউফের উদ্দেশ্য এবং ফলাফলও ইসলামের উদ্দেশ্য ও তার প্রয়োজনীয় ফলাফল থেকে কর্মবাদী বিভিন্ন। মানুষকে সুপরিপাক খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার জন্যে তৈরি করা তার উদ্দেশ্যে নয় কুরআন লেখায় দায়িত্ব দান করা যে জিনিসের কথা বিবৃত করেছে তা তৈরি করাও তার উদ্দেশ্য নয়। তার মাধ্যমে এমন লোকে তৈরি হয়নি যে,
দীনের পূর্ণ স্বরূপকে উপলব্ধি করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে চিন্তা করতে এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে পারে। এ তৃতীয় শ্রেণীর তাসাউফের আমরা পূর্ণ বিরোধিতা করি না আবার পূর্ণ সমর্থনও করি না। বরং তার সমর্থক ও অনুগতদের নিকট আমাদের আরহ হলে এই যে, মেহরবানী করে মহান ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাকে বস্তুতে রেখে আপনি কুরআন ও সুন্নাহ আলোকে এ তাসাউফের ওপর সমালোচনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করন এবং একে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করন। উপরন্তু যে ব্যক্তি এ তাসাউফের কোনো বিষয়কে কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী দেখার কারণে তার সাথে মতবিরোধ করে, আপনি তার মতের সাথে বিরোধ করন বা তাকে সমর্থন করন—অবশ্য তার এই সমালোচনার অধিকার অধীকার করতে পারেন না এবং খামাখা তার নিষ্পাদন মুখ্য হতে পারেন না।

২. শায়খের আকৃতি ধান করা সম্পর্কে আমার মত হলো এই যে, এ প্রসঙ্গে দৃষ্টিক দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমটি হলো একটি কার্য হিসেবে আর দ্বিতীয়টি হলো পুষ্টি নিকটবর্তী হবার একটি মাধ্যম হিসেবে।

প্রথম অবস্থায় এ কার্যটির কেবল বৈধতা ও অবৈধতার প্রশ্ন উঠে। মানুষ কোনো নিয়ত এ কার্য করে, তার ওপর এর সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। একটি নিয়ত এমন আছে যার পরিপ্রেক্ষিতে একে হারাম বলা ছাড়া গতিশীল নেই। দ্বিতীয় নিয়তটি এমন যার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো ফকিরহ পক্ষে একে অবৈধ বলা কঠিন হয়ে পড়ে। এর দৃষ্টিকে এমন ৪ যেমন আমি কোনো ব্যক্তিকে একটি অপরিচিত মহিলার দিকে এক দৃষ্টি চেয়ে থাকতে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি করেছে? সে জবাব দিল। ৪ আমার সৌদর্য পিপাসা নির্ভুল করছি। বলা বাহুল্য আমাকে বলতে হবে যে, তুমি অবশ্য একটি খারাপ কাজ করেছে। অন্য একজনকে এ কাজ করতে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করায় সে বললো। ৪ আমি একে বিয়ে করতে চাই। এ অবস্থায় আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হবে যে, তোমার এ কাজ অবৈধ নয়। কারণ আমি এমন একটি কারণ বিবৃত করছে যাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ বলা যেতে পারে না।

শায়খের চিত্র ধান করার দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সম্পর্কে আমার মনে কোনোদিন সন্দেহ ছিল না, আজও নেই এবং অনেক মহান ব্যক্তির সাথে এর সম্পর্ক দেখানো এভাবে সম্পাদিত কার্যটি পূর্ণতায় অবৈধ। আমার মতে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সূচি করার ও তা বৃত্তি করার মাধ্যম বিবৃত করার ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল কখনো কোনো একটি করেননি। তাহলে তাঁদের বিবৃতি মাধ্যমের ওপরই আমরা নিষ্ঠুর করবো না কেন? কেন আমরা এমন মাধ্যম উদ্ভাবন
করতে সচেষ্ট হবে, যা সংশয়ে পরিপূর্ণ এবং যার ব্যাপারে সামান্য অসতর্কতা মানুষকে নিষ্ঠেত ও সুস্পষ্ট গোমরাহীর দিকে পরিচালিত করতে পারে?

এ প্রসঙ্গে এ আলোচনা নীতিগতভাবে অর্থসন্ধানের মে, অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারে যখন শরীয়তের গতিবর্ধনে পৌঁছা জন্যে আমরা মোবাহ মাধ্যমসমূহ গ্রহণ করার অধিকার রাখি, তখন আত্মশূন্তি ও খোদার নেক্ত লাভের ব্যাপারে আমাদের কেনা ঐ মাধ্যমসমূহ ব্যবহার করার অধিকার থাকবে না? এ মুক্তি নীতিগতভাবে ক্রিটিকাঁর। কেননা দীর্ঘ দুই বিভাগ পরিপর ভিন্ন প্রকৃতির অধিকারী। একটি বিভাগ হলো খোদার সাথে সম্পর্কের আর দ্বিতীয় বিভাগটি হলো মানুষ ও দুনিয়ার সাথে সম্পর্কের। প্রথম বিভাগটির নীতি হলো এই যে, এতে খোদা ও তাঁর সমস্ত বিষয় ইব্রাহিম ও পশ্চিমের ওপর আমাদের নির্ভর করা উচিত। এতে কোন প্রকার কমিটি বা খাতিক ফোরার অধিকার আমাদের নেই। কেননা কুরআন ও সুন্নাহের ছড়া আমাদের নিকট খোদা জান ও তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার পাশে তাঁর জানার পূর্বে তাঁর কোনো মাধ্যম নেই। এ ব্যাপারে যাবতীয় ক্রিটিকাঁদের খাসু শহীদ এবং প্রত্যেকটি বাদাত গোমরাহিন নামকর। যা কিছু নিষ্ঠেত নয়, তা মোবাহ, এ নীতি এখানে অচল। বরং এই বিপ্লবীর পক্ষে এখানে নীতি হলো এই যে, যাকিন্ত কৃষ্ণ ও সুন্নাহের দ্বিতীয় নয়, তা বেদাত। এখানে কিয়াদের (সদিন ঘটনায় হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ) মাধ্যমেও যদি কোনো বিষয় স্বীকৃত হয়, তাহলেও অবশেষে কুরআন ও সুন্নাহের বিষয়ে তাঁর কোনো ভিক্তি থাকতে হবে। বিপ্লবীর পক্ষে মানুষের সাথে সম্পর্ক ও দুনিয়ার সাথে সম্পর্কের বিভাগসমূহে মোবাহ বিয়োজনসমূহ সুস্পষ্ট। যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার আনুগত্য করতে। যে সম্পর্কে নিষ্পত্তি করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকতে এবং যে বিষয়ে কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি; যদি তাঁর সামগ্রিক কোনো বিষয়ে কোনো নির্দেশ পাওয়া যায়, তাহলে তাঁর পর কিয়াদের করতে। অথবা যদি কিয়াদের সুযোগ না থাকে, তাহলে ইসলামের সাধারণ নীতি অনুযায়ী মোবাহসমূহের মধ্যে যে বিষয় ও পশ্চিমের ইসলামী ব্যবস্থার মেজাজে অনুযায়ী পান, তাকে গ্রহণ করতে।

এ বিভাগে আমাদেরকে এ আজাদী দান করার প্রস্তাব হলো এই যে, আমরা যেন পৃথিবী, মানুষ ও পৃথিবির বিষয়াবলী সম্পর্কিত জানা আহরণ করার মুক্তি ও তুঙ্গুন উপকরণ কমপক্ষে এরুপুকুর অবশ্য অর্জন করি, যার ফলে খোদার কিন্তু ও রসূলের সুন্নাহের মন্ত্রণালোচনা পর আমরা ভালোকে মন্দ থেকে এবং সত্যকে মিথ্যা থেকে শুধু করতে পারি। কাজেই এ আজাদী কেবল ঐ বিভাগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। তাকে প্রথম বিভাগটি পর্যন্ত বিস্তৃত করতে, যা কিছু নিষ্ঠেত নয়, তাকে মোবাহ মনে করে খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের
ব্যাপারে নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার করা অথবা অন্যের কাছ থেকে আহরণ করে তা গ্রহণ করা একটি মৌলিক ক্রটি। এই ক্রটির কারণে খৃষ্টানরা ‘রাহবানিয়াত’ আবিষ্কার করে, কুরআনে এর নিন্দা করা হয়েছে।— (তরজুমানুল কুরআন, জমাদিউল আউয়াল, ৭১ হিজরী, ফেব্রুয়ারী ’৫২ মুহুর্ত)
একটি মিথ্যা দোষারোপ ও তার জবাব

প্রশ্ন
আপনার ওপর দোষারোপ করা হয় যে, আপনি আসলে নিজে মুজাদ্দিদ বা মেহদী হবার দাবীরাি। অথচা পদাতকরে থেকে নিজেকে মুজাদ্দিদ বা মেহদী বলে স্বীকার করার জন্যে চেষ্টা করেছেন। এ দোষারোপের তাত্ত্বর্প কি ?

জবাব
তরজমানুল কুরআনে বহুবার এ দোষারোপের প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাই এবার কোনো নতুন জবাব দেবার পরিবর্তে আমার আগের জবাবগুলোই উদ্ধৃত করা হয়েছে।

সব্যস্তথে ১৯৪১ সালে মাওলানা মুনাজির আহসান গীলানী কর্তৃক বাংলার নিম্নবর্ণে আমার সম্পর্কে এ সদৃশ প্রকাশ করেন। এর জবাবে আমার 'সদৃশ নির্দেশ' নামক প্রবন্ধে আমি আরজ করেছিলাম :

“আমার সাসহসুলভ শনাক্ত থেকে সভ্যতার অধিকার জন্যে যে, আমি নিজেকে বিরাট কিছু মনে করি এবং কোনো বিরাট মর্যাদার আশা পোষণ করি। অথচ আমি যা কিছু করছি, কেবল নিজের গোনাহার মাফ করার জন্যে করছি। নিজের মূল্য আমি খুব ভাল করেই জানি। বিরাট মর্যাদা তো দূরের কথা, যদি কেবল শান্তি থেকেও নিষ্ঠুরতি পাই, তাহলে আশাতিরিক্ত মনে করি।”

-(তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর-১৯৪১)

অতঃপর ঐ সময় মাওলানাসাইয়েদ শোলায়মান নদবী আমার একটি বাক্য গুলট-পালট করে তার থেকে এ অর্থ গ্রহণ করার চেষ্টা করেন যে, আমি মুজাদ্দিদ হবার দাবীরাি। অথচ ঐ বাক্যের মধ্যে আমি নিজের নগণ্য প্রচেষ্টাবলীকে দীনের তাজদীদের প্রচেষ্টার মধ্যে একটি প্রচেষ্টা বলে গণ্য করেছিলাম। তার এই সুপশষ্ট দোষারোপের জবাবে আমি বলেছিলাম :

“কোনো কাজকে তাজদীদের কাজ বলার এ অর্থ হয় না যে, যে ব্যক্তি তাজদীদের কাজ করবে তাকে মুজাদ্দিদ পদবীর দান করতে হবে। আর শত্রুর মুজাদ্দিদ হওয়া তো অনেক বড় কথা। ইতু উঠিয়ে নিয়ে প্রাচীর নির্মান করা অবশ্য একটি গঠনমূলক কাজ। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, যে
বাড়ি কয়েকটি ইট উঠিয়ে নিয়ে বসিয়ে দেবে, তাকে ইজিনিয়ার বলা হবে, আবার ইজিনিয়ারও সাধারণ নয়, শতাধিক ইজিনিয়ার! অন্য পাউন্ডের কোনো বাড়ি নিজের কাজকে যদি তাজদিদী কাজ বা তাজদিদী প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করে—যখন পান্টে দীনের তাজদীদের উদ্দেশ্যেই সে এ কাজ করে—তখন সেটি হয় নিছ্ক একটি পান্ট ঘটনার প্রকাশ এবং তার অর্থ এ হয় না যে, সে মুজাদ্দিদ হবার দাবি করেচ এবং তার শতাধিক মুজাদ্দিদ হতে চায়। কুর্সরে লোকেরা অবশ্য সামান্য কাজ করে বড়ো বড়ো দাবি করতে থাকে বরং দাবিতে আকারই কাজ করার বাসনা করে। কিন্তু কোনো জানী বাড়ির নিকট আসা করা যায় না যে, তিনি কাজ করার পরিবর্তে নিছ্ক দাবি করবেন। দীনের তাজদীদের কাজ ভারতরবে ও ভারতরবের বাইরে অনেকে করেছেন। মাওলানা সাহেবকে (অভিযোগকারী) আমরা এরি মধ্যে গণ্য করি। আমিও নিজের সামর্থ মোহাবেক এ কার্যে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করেছি এবং বর্তমানে আমরা কতিপয় দীনের খেদমতকারী একটি জ্ঞানাধিরের আমার এ কার্য সম্পাদন করার চেষ্টা করছি। আল্লাহ তায়ালা যার কাজের মধ্যে এমন বরংক দান করবেন যে, তার ফলে তার হাতে যথার্থ খোদার দীনের তাজদীদের কার্য সম্পন্ন হবে, আসলে তিনিই হবেন মুজাদ্দিদ। দাবি করা বা দুনিয়ার কাউকে মুজাদ্দিদ উপাধি দান করা আসল জিনিস নয়। বরং আসল জিনিস হলো এই যে, মানুষকে এমন কাজ করে তার যথার্থ মালিকের নিকট পৌছতে হবে যে, সেখানে যেন সে মুজাদ্দিদের মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়। মাওলানার জন্য আমি এ জিনিসটিরই দোয়া করি। এবং তিনি যদি অনেক জন্য এ দোয়া করেন যে, আল্লাহ তায়ালা যেন তার সাহায্যে দীনের এমনি সব কার্য সম্পাদন করেন, তাহলেই বেহতের হবে। আমি আশ্চর্য হই যে, অনেক ইসলামী শাসক খামাবা “বিভীষিকা” বানিয়ে রাখা হয়েছে।

দুনিয়ার কোনো বাড়ির রোম জাতির পৌরব পুনর্নিজীবনের দাবী নিয়ে অবতীর্ণ হয় আর রোম জাতীয়তাবাদের পৃষ্ঠার তাপে স্বাগত জানায়, কোনো বাড়ির বৈদিক সংস্থার পুনর্নিজীবনের দাবি নিয়ে অভ্যস্ত হয়, আর হিন্দুরা তাকে সমর্থন জানায়। কোনো বাড়ির ধরনী শিশুকে পুনর্নিজীবিত করার ইচ্ছায় এগিয়ে আসে আর শিলানুরাগীরা তার হিতে বাড়িয়ে দেয়। এসকল সংক্রান্তির কার্যাবলীর মধ্যে একমাত্র খোদার দীনের সংক্রান্তি কি এমন একটি অপরাধ যে, তার নাম উচ্চারণ করতে মানুষ লজ্জা অনুভব করবে এবং কেউ এ ধরনের চিত্তা প্রকাশ করলেই খোদার পৃষ্ঠার তার পিছনে লেগে যাবে।”-(তরুজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৪১, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২)
ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন

এ সুপ্নিত বিবরণের পরেও আমাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাদের প্রচারণা বন্ধ করেননি। কেননা! মুসলমানদেরকে আমার বিরুদ্ধে উদ্বোধিত করার জন্যে যে সমস্ত অন্য প্রয়োগ করার প্রয়োজন ছিল তনুধ্যে আমার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার দাবী করার অভিযোগ উঠাপন করাও একটি অস্ত্র ছিলো। কাজেই ১৯৪৫ ও ’৪৬ সালে অনবরত এ সন্ধের ছুঁড়িকে ছড়ানো হয়েছে যে, এ ব্যক্তি ‘মেহদী’ দাবী করার প্রতুলিত নিচ্ছ। এ সম্পর্কে আমি ১৯৪৬ সালের জুন সংখ্যা তরজুমানূল কুরআনে লিখেছিলাম:

“যারা এ ধরনের সন্ধে পোষণ করে মানুষকে জামাযাতে ইসলামীর দাওয়ার থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন, আমি তাদেরকে এমন একটি ভয়াবহ শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত করেছি যে, তা থেকে তারা কোনো ক্ষুদ্র লাভ করতে পারবে না। সে শাস্তি হলো এই যে, ইনশাআল্লাহ আমি সব রকমের দাবী থেকে নিজেকে নিক্ষুলু রেখে আমার খোদার সমীপে হাজির হয়ে যাবো এবং তারপর দেখবো যে, এরা খোদার সম্ভাব্য নিজেদের এসব সন্ধে এবং এগুলো বিবৃত করে মানুষকে হকের পথে অহসার হওয়া থেকে বিরত রাখার স্পর্শে কি সাফাই পেশ করেন।”

এসব লোকের দিলে যদি কিছু পরিমাণ খোদাতীতি ও পরকাল বিশ্বাস থাকতো, তাহলে আমার এ জবাবের পর তাদের মুখে পূর্ববাহ এ অভিযোগ শুনা যেতো না। কিছু কেমন নিতীকাবাদে আজ আবার সেই অভিযোগগুলোকে ছড়ানো হচ্ছে, তা সবাই প্রত্যক্ষ করছেন। তরজুমানূল কুরআনের সাম্প্রতিক সংখ্যাসমূহে এ সম্পর্কে যাবিক্ষু লিখেছি, তা অধ্যয়ন করার পরও এদের কারার মুখে অপার্থচার একটিও বাড়ছে না। আত্মরাতের ফায়সালা অবশ্য খোদার হতে, কিছু আমাকে জানান, এ ধরনের কার্যকলাপের ফলে দুনিয়ায় আলেম সমাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত থাকার আশা আছে কি?

মজার কথা হলো এই যে, ‘ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন’ কিংবদন্তির বিভিন্ন বাক্যের ওপর এসব সন্ধের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে এবং তার উদ্দেশ্য বিভিন্ন রঙে রঙিন করে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করে জনগণকে বিদ্রোহ করা হচ্ছে। অথচ তারই পৃথিয়া আমার এ একথাগুলো আছেঃ

“দাবীর মাধ্যমে কার্যান্তর করার অধিকার নবী ছাড়া আর কারোর নেই এবং নবী ছাড়া আর কেউ নিশ্চিতভাবে একথা জানেন না যে, তিনি কোন কার্যে আদিষ্ট হয়েছেন, মেহদী কোনো দাবী করার জিনিস নয়। এ ধরনের দাবী যারা করেন আর যারা এর প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করেন আমার মতে

www.icsbook.info
তাঁরা উভয়েই নিজেদের জ্ঞানের স্বল্পতা ও মানসিক অধোগতির প্রমাণ পেশ করেন।”

আজ যেসব লোক আমার বই থেকে উদ্ধৃতাংশ পেশ করেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে, আমার ঐ বইয়ে উল্লিখিত কথাগুলো কি তাদের নজরে পড়েছি? অথবা তারা সজ্জায় এগুলো প্রচুর রেখেছেন ?-(তরজমানুল কুরআন, ফিলকদ, ফিলহজ, ’৭০ হিজরী, সেপ্টেম্বর ১৯৫১ খ্রিঃ)
আল মেহদীর আলামত ও ইসলাম ব্যবস্থায় তার স্রোত

প্রশ্ন

"ইমাম মেহদীর আবির্ভাব সম্পর্কে আপনি 'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন' কিভাবে যা লিখেছেন, তাতে দ্বিতীয়ের অবকাশ আছে। আপনি মেহদীর জন্যে কোনো বিশেষ আলামত স্বীকার করতে রাজি নন। অথচ হাদিসে মেহদীর আলামতের সুপ্রীষ্ঠ উল্লেখ আছে এ ক্ষেত্রে এসব হাদিসকে কেমন করে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ?"

জবাব

ইমাম মেহদীর আবির্ভাব সম্পর্কে হাদিসে যেসব বর্ণনা আছে সে সম্পর্কে হাদিস বিশ্লেষণকারীগণ এত কঠোর সমালোচনা করেছেন যে, তাদের মধ্যে একটি দল আবার ইমাম মেহদীর আবির্ভাবকে স্বীকারই করেন না। এ হাদিসগুলো যারা বর্ণনা করেছেন তাদের সমালোচনা করার পর জানা যায় যে, তাদের অধিকাংশ বর্ণনাকারীর শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। ইতিহাস পর্যালোচনা করেও জানা যায় যে, এতেকটি দল নিজেদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বার্থোদ্ধারের জন্যে এ হাদিসগুলো ব্যবহার করেছেন এবং নিজেদের কোনো ব্যক্তির পায় সংশ্লিষ্ট আলামতসমূহ লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। এসব কারণে আমি এ শীর্ষায় সৌচিত্য এই, ইমাম মেহদীর নিহতি আবির্ভাবের ব্যাপারে এ হাদিসগুলো বর্ণনা সত্য কিন্তু বিস্তারিত আলামত সম্পর্কিত বর্ণনাগুলোর অধিকাংশই সমস্ত মন্দ এবং স্বার্থবাদীরা সমস্ত পরবর্তীকালে এগুলো নবী করীমের অসাধারণ শীর্ষায় ওপর বৃদ্ধি করেছ। বিভিন্ন যুগে যেসব লোক মেহদী হবার মিথ্যা দাবী করেছে তাদের বইপত্র ও দেখা যায় যে, তাদের সকল ফেতনা সৃষ্টির মূলে এ বর্ণনাগুলোই তথ্য সরবরাহ করেছে।

নবী করীম (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর আমি দেখেছি যে, তাদের ধরন কখনো মেহদীর আবির্ভাব সম্পর্কিত হাদিসের নয় নয়। নবী করীম (স) কখনও কোনো আগমনকারী বস্তুর আলামত ও বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে দেননি। তিনি অবশ্য বড় বড় মূল আলামত বর্ণনা করতেন, কিন্তু খুঁটিনাটি বিবরণ দান তাঁর পদ্ধতি ছিল না।

8——
"মেহদীর আগমনের প্রয়োজনকে 'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন' পুককে রীকার করে নেয়া হয়েছে কিন্তু মেহদীর কাজ কি হবে, এ সম্পর্কে হাদিসের উল্লেখ ছাড়াই নিহিম নিজের কথায় বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। হাদিসের আলোকে এগুলো বর্ণনা করাই সংগ্রষ হবে। উপরন্তু মেহদীর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের প্রয়োজন প্রভৃতি সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা হয়নি এবং তাঁকে সাধারণ উজ্জিদ্বিদগণের ন্যায় গণ্য করা হয়েছে। যদিও কামিল উজ্জিদ্বি ও অপরিণত উজ্জিদ্বির শেষী বিভাগ করার কারণে মনে হতে পারে যে, সম্ভবত এখানে আভিধানিক অর্থে উজ্জিদ্বি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, পারিভাষিক অর্থে নয়, তবে উজ্জিদ্বি যখন পাপমুক্ত হন না, এবং মেহদীর পাপমুক্ত হবার প্রয়োজন, তখন এ সুপ্তি পার্থক্য থাকার পর মেহদী কোনো করে উজ্জিদ্বির ফিরিত্তিকে ওমার করা যেতে পারে।"

জবাব

প্রথমতঃ হাদিসে ব্যবহৃত "মেহদী" শব্দটি সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। নবী করীম (স) মেহদী শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হলো সত্তিক পথে প্রাপ্ত 'হাদি' শব্দ ব্যবহার করা হয়নি, সত্তিক পথে অবলম্বনকারী প্রত্যেক কাজকর্মের মেহদী হতে পারেন। বড়ঝরের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করার জন্যে 'আল মেহদী' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর সাহায্যে আগমনকারীর কোনো বিশেষ গুণ প্রকাশ করাই আসল উদ্দেশ্য আর এ বিশেষ গুণ সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে যে, আগমনকারী নরুয়ারের পদ্ধতিতে খেলাফতের ব্যবস্থা (খেলাফত আলা মিনহাজিন নরুয়াত) ছিলোনি হয়ে যাবার এবং পৃথিবী যুলুম নির্যাতনে ভাবে যাবার পর পুনরায় নতুন করে নরুয়ারের পদ্ধতিতে খেলাফত কায়ম করবে এবং নয়া ও ইনসাফ দ্বারা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করবে। এজন্য তাঁকে বৈশিষ্ট্যশালী করার উদ্দেশ্যে "মেহদী" শব্দের পূর্বে 'আল' সংযোগ করা হয়েছে। কিন্তু একথা মনে করা চূল যে, মেহদী নামে ইসলামে কোনো মর্যাদাপূর্ণ পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাঁর ওপর ঈমাম আনা ও সে সম্পর্কে জান না। নবীদের ওপর ঈমাম আনা ও তাদের আনুগত্য করার ন্যায় নাজাত লাভের এবং ইসলামও ঈমানের জন্য শর্ত স্বরূপ। উপরূপ মেহদী হবেন কোনো নিপাক ঈমাম, হাদিসে এ ধারণাও কোনো অস্তিত্ব নেই। আলোর গায়ের নবীদের সম্পর্কে নিপাত হবার এই ধারণা নির্জন শিয়া চিটাব্বাসুত। কুরআন ও সুন্নাহে এর কোনো উল্লেখ নেই।

একথা ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত যে, মেসব জিনিসের ওপর ঈমাম ও কুফরী নির্ভরশীল এবং মেসব বিষয়ের ওপর মানুষের নাজাত নির্ভরশীল,
সেগুলো বিবৃত করার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার নিজের ওপর নিয়েছেন। সেসব কুরআনে বিবৃত হয়েছে। এবং কুরআনেও সেগুলো নেহাত ইশারা ইংরিজিতে বিবৃত করা হয়নি বরং দ্বারাহীন ভাষায় সুপরিপ্রেরণে বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার নিজেই বলেন যে- 

“মানুষেরা সতিক পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আমার নিজের।” 

কাজেই যে বিভিন্নটি ইসলামে এই পর্যায়ে পৌঁছে যায় তার প্রমাণ অবশ্য কুরআন থেকে দিতে হবে। ঈমান ও কুফরী যে জিনিসটির ওপর নির্ভরশীল, নিছক হাদিসের উপর তার ভিত্তি স্থাপন করা যেতে পারে না। হাদিস কতিপয় ব্যক্তির মাধ্যমে কতিপয় ব্যক্তির নিকট পৌঁছে। এ থেকে বড়োজুর নিকট ধারণা লাভ করা যেতে পারে, বিশিষ্ট জ্ঞান নয়। বলা বাহুল্য, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্ধবদেরকে কথার বিপদ ফেলতে চান না। যেসব বিষয় তাঁর নিকট এতবেশী গুরুত্বপূর্ণ যে তার মাধ্যমে ঈমান ও কুফরীর পার্থক্য সৃষ্টি হয় তাকে তিনি মাত্র কতিপয় ব্যক্তির বর্ণনার ওপর ছেড়ে দিতে পারেন না। এ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুকে অবশ্য আল্লাহ তাঁর কিতাবে দ্বারাহীন ভাষায় বর্ণনা করেন, আল্লাহর সন্তান সেগুলোকে নিজের পয়গম্বরীর আসল কাজ মনে করে ব্যাপক ও সাধারণভাবে তা প্রচার করেন এবং পূর্ণ সংশয়হীন পর্যায়ে সেগুলো প্রত্যেক মুসলমানের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।

মেহদী সম্পর্কে যতই টেনে-হিচড়ে ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই দেখতে পারেন যে, ইসলামে তার অবস্থা এমন নয় যে, তাঁকে জনার ও বীকার করার ওপর কোনো ব্যক্তির মুসলমান হওয়া ও নাগাজ লাভ নিজের করে। তিনি যদি এ পর্যায়ে অবস্থান করতেন, তাহলে কুরআনে দ্বারাহীন ভাষায় তা বর্ণনা করা হতো এবং নবী করিম (স) ও মাত্র দু-চারজন লোকের নিকট তা বর্ণনা করা যথেষ্ট মনে করতেন না বরং সমস্ত উক্তের নিকট তা পৌঁছিয়ে দেবার জন্য যথাসাধ্য প্রচার চালাতেন। তৌহিদ ও আখেরাতের কথা প্রচারের ক্ষেত্রে আমরা তাঁকে যে রুপে দেখি, এ বিষয়টি প্রচারের ক্ষেত্রে ঠিক সেইরূপে আমরা তাঁকে দেখতাম। আসলে যে ব্যক্তি ইসলামী জানের ক্ষেত্রে সামান্য গতির দৃঢ়তাতের ব্যাপক তিনি এক মুহূর্তের জন্যে একথা বিশ্বাস করতে পারেন না যে, ইসলামে যে বিষয়টির এতবেশী গুরুত্তু, সেটিকে নিছক খবর ওয়াহেদের যে হাদিসের বর্ণনামূলক কোনো এক পর্যায়ে একজন, দু’জন বা তিনজনে এসে ঠেকে) এর ওপর ছেড়ে দেয়া যায় না। আর খবরে ওয়াহেদের এমন পর্যায়ের যে, ঈমাম মালিক (র), ঈমাম বুখারী (র) ও ঈমাম মুসলিমের (র) নয়া মুহাদিসগণ সেগুলোকে নিজেদের সংকলনে স্থান দেয়া পছন্দ করেননি। -(তরঙ্গমালাকুরআন, রবিউল আউয়াল, জমাদিউল আখেরে, ১৩৬৪ হিজরী, মার্চ-জুন, ১৯৪৫ খ্রিঃ)
মেহদী সমস্যা

করিমপুর দীনদার ও আন্তরিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি ‘ইসলামী রেনেসাঁ আমোলন’ পুস্তকে আপনার ইমাম মেহদী সম্পর্কে বর্ণনাবলীর বিরুদ্ধে হাদিসের আলোকে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তাদের আপত্তিসমূহ আপনার সমূহে পেশ করছি। একথা বলার পেছনে আমার এ অনুভূতি সক্রিয় রয়েছে যে, দীন প্রতিষ্ঠার দাওয়াতের সময় কাজে শরীয়তের আনুগত্য অপরিহার্য। কাজেই আপনার লেখনী প্রসূত প্রত্যেকটি জিনিস শরীয়ত মোতাবিক হতে হবে। আর যদি কখনো আপনার লেখনী ক্রটিপূর্ণ মত ব্যক্ত করে, তাহলে তা গুরুতর নেবার ব্যাপারে যেন কোনো প্রকার ইতস্ততঃ তার না থাকে।

১. ইমাম মেহদী সম্পর্কে আপনি ৩১ হতে ৩৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যা লিখেছেন, তা আমাদের জান অনুযায়ী হাদিস বিরোধী। এ প্রসঙ্গে আমি তিরিমিয়ি ও আবু দাউদের সমন্ত হাদিস অধ্যয়ন করেছি। তা থেকে জানা যায় যে, কোনো কোনো হাদিসের বর্ণনাকারী অবশ্যি কারণে অথবা প্রতিষ্ঠাহুতি; কিন্তু আবু দাউদ ও তিরিমিয়িতে এমন হাদিস অবশ্যি আছে যার বর্ণনাকারী বিষয়ে ও সত্যবাদী। তারা আপনার মতের সত্যতা প্রমাণ করে না বরং তার প্রতিবাদ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আবু দাউদের হাদিসটি দেখুন:

 حدثنا محمد بن المثنى ........ عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من اهل المدينة هارنا إلى مكة فياتيه ناس من اهل مكة فيخر جونه وهو كاره فينا يعونه بين الركن والمقام. (كتاب المدى)

 এ হাদিসটি থেকে নিয়ে শেষ হাদিসটি পর্যন্ত পড়ুন। দেখেছেন সকল বর্ণনাকারীই বিষয়। উপরন্দু বায়হাকির একটি বর্ণনা মিশকাদের কিংবদন্তি ফিতানে বর্ণিত হয়েছে:

 عن ثوبيان قال رايم الرايتم الرايتم السود قد جاءت من قبل خرا سان فاتوها فان فيها خليه الله المهدي.

১. বর্তমান সংক্রান্তের ২৬ হতে ২৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

www.icsbook.info
মেহেদী তার মেহেদী হওয়া সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে উপরোক্ত হাদিসগুলো আপনার একথার প্রতিবাদ করছে। বিশেষ করে একথাগুলো দেখুন।

ওঝু উপল কল মুষেন নামো ও আল ইজাবী

তাছাড়া তিরিমিয়ির একটি বর্ণনার একথাগুলো অনুক্রান্ত করুন।

প্রকাশক সেল রোহল ফিকুদ যা মুহিদি! আকুকি! আকুকি! আকুকি! ফিকুদি

হন ফিকুদ মাস এস্তিত্ব অন্য হলে।

২. আপনি বলছেন যে, মেহেদী আধুনিক ধরনের নেতা হবেন ——

ইতাদি। আপনার এ দাবীর স্পষ্টকে কেনা হাদিস নেই। থাকলে লিখে জানাবেন। যারা আপনার মতের বিপরীত মত প্রকাশ করে, তাদের স্পষ্টকে

বাস্তব প্রমাণ হলো এই যে, এতদিন পর্যন্ত যতজগুলো ফুজাদিদ এসেছে তাদের

সবাই প্রধানতঃ মুসলিম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৩. আপনার এ কথাই যে তিনি আধুনিক ধরনের নেতা হবেন, সম্ভব পোষণ করা হচ্ছে যে, আপনি নিজেই ইমাম মেহেদী হবার দাবী করবেন।

৪. ‘আলামতে কিয়ামত’ পুস্তকে (লেখকে মাওলানা শাহ রফিকীউদ্দিন, 

অনুবাদকে মুমাউলী নুর মুহাম্মদ) ইমাম মেহেদী সম্পর্কে মুসলিম ও রূহানীর

বরাত দিয়ে কতিপয় হাদিস বর্ণিত হয়ছে। কিন্তু অনুসঙ্গ করার পর মুসলিম

ও রূহানীতে আমি এমন কোনা হাদিস পাইনি। এ পুস্তকে উদ্ধৃত একটি

হাদিসে বলা হয়েছে যে, মেহেদীর হাতে বাইতার গ্রহণ করার সময় আরাম

থেকে আওয়াজ আসবে –

এই হাদিসটি সম্পর্কে আপনার কি মত ?

জবাব

১. ইমাম মেহেদী সম্পর্কে যেসব হাদিস বিভিন্ন হাদিস পুস্তকে লিপিবদ্ধ

হয়েছে, সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি আমার অনুসন্ধানের সংক্ষিপ্ত পেশ

করেছি। যারা ইমাম মেহেদী সম্পর্কে কোনো কথা তীক্ষ করার জন্যে কেবল

সে কথাটি হাদিসের কোনো ফিকুদতে উল্লেখিত থাকাই যথেষ্ট মনে করেন,

অথবা অনুসন্ধানের হক আদায় করার জন্যে কেবল বর্ণনাকারীরাই সত্যবাদী

কিনা একথা জানাই যথেষ্ট মনে করেন, তাহলে তাদের জন্যে সেই ধরনের

বিশ্বাস রাখা বৈধ যা তারা হাদিসে পেয়েছেন। কিন্তু যারা এ সমস্ত হাদিস

www.icsbook.info
এটিকিত কর এদের তুলনামূলক অধ্যয়ন করো এবং তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বৈপরীত্যের সন্ধান পাও, উপরতু যাদের সম্মুখে বনি ফাতেমা, বনি আব্বাস ও বনি উমাইয়ার সংঘর্ষের পূর্ব ইতিহাস আছে এবং তারা পরিক্ষার দেখন যে, এ সংঘর্ষ বিভিন্ন দলের ব্যক্তিত্ব অসংখ্য হাদিস রয়েছে এবং বর্ণনাকারীদের মধ্যেও অধিকাংশ তারাই যাদের কোন এক পক্ষের সাথে প্রকাশ্য সম্পর্ক ছিল, তাদের জন্য এ হাদিসগুলোর মধ্যে বিভিন্ন অংশকে নির্দূর মেনে নেয়া কঠিন। আপনি নিজেও যে হাদিসগুলো বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যেও এই সূত্রের অর্থাতঃ “কালো খাঁজ”র উল্লেখ আছে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, কালো খাঁজ ছিল বনি আব্বাসের ঐতিহ্য। উপরতু ইতিহাস থেকে এও জানা যায় যে, এ ধরনের হাদিসের পেশ করে বাদশাহ মেহদী আব্বাসীকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এ প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। এখন যদি কেউ এ বিষয়টি মেনে নেয়ার পর জোর দেন, তাহলে তিনি একে মেনে নিতে পারেন এবং ‘ইসলামী রেনেমী আন্দোলন’ পুনরায় আমি যে মত প্রকাশ করেছি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক, তত্ত্বাত্মক ও ফিকাহ সম্পর্কিত বিষয়ে আমার কথাই সবার জন্যে কর্মকান্ত হবে, এমন কোনো কথা নেই। এসব বিষয়ে আমার কোনো অনুসন্ধান করার জন্যে পছন্দিত না হলে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারেও আমার সাথে সহযোগিতা করা তার জন্যে হারাম হয়ে যাবে, একথাও ঠিক নয়। হাদিস, তাফসীর, ফিকাহ প্রভৃতি শাস্ত্রে শাস্ত্রীয়দের মধ্যে বিভিন্ন মতের উড়ব হওয়া। আমার কোনো নতুন কথা নয়।

২. প্রতিষ্ঠিত মেহদী আধুনিক ধরনের লীডার হবেন, আমার একাধার অর্থ এ নয় যে, তিনি দাড়ি চেঁথে ফেলবেন, সুট কোট পরবেন এবং আপ্টিডেট ফাসানে চলাচলের করবেন। বল এর অর্থ হলো এই যে, তিনি যে জামানায় পড়া হবেন সে জামানার আন্বিকাত, অবস্থা ও প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকাফেহাল থাকবেন। সমকালীন যুগোপোষীর বস্তুর কর্মসূচি প্রকাশ করবেন। এবং সমকালীন রৈশাসিক গবেষণা অনুসন্ধানের মাধ্যমে আবিষ্কৃত যুদ্ধপর্তি ও উপায়-উপকরণ ব্যবহার করবেন। এটি একটি আকাট্য যুক্তিপূর্ণ কথা। এর জন্যে কোনো আদীসের প্রয়োজন নেই। নবী করিম (স) যদি তাঁর যুগের পরিপাক, কাঠের কামান (Battering Ram), প্রত্যন্ত নিক্ষেপণ যুদ্ধ প্রত্যুষ্ট ব্যবহার করতে পারবেন, তাহলে আগামী কোনো যুগে তাঁর নবী করিমের রহস্যময়িতের হক আদায় করতে অর্থসর হবেন তিনি অবশ্য ট্যাংক, এরোপ্লেন, জান-বিজ্ঞান ও সমকালীন অবস্থা ও বিভিন্ন শাস্ত্রীয় থেকে সম্পর্কিত হয়ে কাজ করতে পারবেন না। শক্তির অধুনিকতম উপায়-উপকরণ লাভ করা এবং নিজের প্রভাব বিস্তৃত

www.icsbook.info
করার জন্য আধুনিক জান-বিজ্ঞান, শিল্প ও কর্মপদ্ধতি ব্যবহার করাই হলো কোনো দলের উদ্দেশ্য সাধন ও কোনো আন্দোলনের বিজয় লাভের স্বাভাবিক পথ।

৩. এই যে কথাটি বললেন যে, “এ থেকে সন্দেহ করা হচ্ছে, তুমি নিজেই ইমাম মেহদী হবার দাবী করবে” এর জবাবে আমি এছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না যে, এ ধরনের সন্দেহ প্রকাশ করা এমন কোনো ব্যক্তির কাজ হতে পারে না, যে খোদাকে ভয় করে, খোদার সম্বুকে নিজের দায়িত্বের অনুভূতি রাখে এবং খোদার এ নির্দেশে ন্যূনতা রাখে যে আমি অন্য থেকে অনেক প্রত্যেক সন্দেহ গোনাহ করে।” যারা এ ধরনের সন্দেহ প্রকাশ করে মানুষকে জামায়াত ইসলামীর দাওয়াত থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছেন, আমি তাদেরকে এমন একটি তীর্থ শাস্তি দিতে মনোনীর করেছি, যা থেকে তারা কোনোমতৈ রেহাই পেতে পারে না। আর সে শাস্তি হলো এই যে, ইসলামের আল্লাহ আমি সব রকমের দাবী থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে খোদার সম্বুকে পৌঁছে যাবে। অতএব এই লোকেরা খোদার সম্বুকে এদের সন্দেহসমূহ এবং সেগুলো বিবৃত করে মানুষকে হকের পথে বাধা দেবার স্পর্শক কি সাফাই গেলে করেন, তা আমি দেখুবে।

৪. ‘আলামতে কিয়ামত’ কিতাবে যে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমি ইতিবাচক বা নেতিবাচক কিছুই বলতে পারি না। যদি তার নিষ্ঠুব এবং সত্য নবী করিম (স) যদি এমন খবর দিয়ে থাকেন যে, মুহাম্মদীর হাতে বাইয়াত গ্রহণের সময় আকাশ থেকে আওয়াজ আসেন যে, হে এই খলিফা উদ্ধৃত রিম্মতকে হিতে ফাস্টেমু মেহদী, এর কথা তোনা ও এর আনুগত্য করো’—তাহলে ‘ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন’ পুস্তকে আমি এ সম্পর্কে যে রায় পেশ করেছি তা তুলো। কিন্তু আমি আশা করি না যে, নবী করিম (স) এমন কথা বলবেন। কুরআন মজিদ অধ্যয়ন করে জানা যায় যে, কোনো নবীর আগমনের আকাশ থেকে এ ধরনের আওয়াজ আসেন। শেষ নবী হ্যারমন্ড (স)-এর পর ঈমান ও কুরফারির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার দ্বিতীয় কোনো সুযোগ আসবে না, তবে তার আগমন আকাশ থেকে এমন কোনো আওয়াজ তুনা যাবার। মক্কার মুশারিকরা দাবী করে তাঁকে যে, আপনার সাথে কোনো ফেরেশতা থাকতে হবে, তিনিই আমাদেরকে জানাবেন যে, ইসলাম নবী। অথবা এমন কোনো সুমধুর নিশানী থাকতে হবে, যা থেকে দ্বীরাহিনভাবে আপনার নবী হবার বিষয় জানা যাবে। কিন্তু আল্লাহ
তায়ালা তাদের এ সকল দায়ী প্রত্যাখ্যান করেন এবং এগুলো গ্রহণ না করার কারণে কুরআনের বিভিন্ন পাঠে বর্ণনা করেছেন যে, সত্যকে পূর্ণরূপে আবরণ মুক্ত করা, যার ফলে বুদ্ধিগত পরীক্ষার অবকাশ না থাকে, এমন পদ্ধতি খোদার হিকমাতের পরিপন্থী। এখন একথা কেমন করে মনে নেয়া যেতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ নিয়ম একমাত্র ইমাম মেহদীর ব্যাপারে পরিবর্তন করবেন এবং তাঁর বাইয়ের সময় আকাশ থেকে আওয়াজ দেবেন যে, “ইনিই খোদার খলিফা মেহদী ঐর কথা শুনো, ঐর আনুগত্য কর।”

-(তরজুমানুল কুরআন, রজব, ১৩৬৫ হিজরী, জুন, ১৯৪৬ খ্রীঃ)